আর্য্য-গৌরব-রক্ষণেচ্ছু, শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ, সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ,

মহোদয়ের হস্তে

আর্য্য-কীর্ত্তি

সাদরে সমর্পিত হইল

বিজ্ঞাপন।

বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোতে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতি নীতি আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার ছেলেরা এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের জীবন-চরিত পড়িয়াই নীতি শিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণা বা স্বজাতি-প্রেমের আবির্ভাব হয় না। বালককাল হইতে বিদেশের কথা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত হইয়া যায় যে, স্বদেশের বিষয় একবারও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আপনাদের দেশে যে, অনেক মহৎ ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের পরোপকার, তাঁহাদের হিতৈষিতা যে, অনন্ত কাল জীবলোককে গভীর ভাবের উপদেশ দিতেছে, ইহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। বিদেশী ভাবে বিদেশের কাহিনীতে জড়িত হইয়া, তিনি সর্ব্বাংশে বৈদেশিক হইয়া পড়েন। স্বদেশের দুঃখে—স্বদেশের বেদনায় তাঁহার মনে দুঃখ বা বেদনার আবির্ভাব হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আর্য্য-কীর্ত্তি প্রকাশিত হইল। ইহাতে ক্রমশঃ হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপের কাহিনী বিবৃত হইবে। অল্প মূল্যে খণ্ডে খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এতদ্দ্বারা পাঠকের হৃদয়ে যদি অণুমাত্রও স্বদেশহিতৈষিতা ও আত্মাদরের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কলিকাতা
১ লা শ্রাবণ, ১২৯০। } শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বিষয়।

74

আর্য্যকীর্ত্তি।

কুম্ভ।

রাজস্থানের মিবার-ভূমি যথার্থ বীরকুল-প্রসবিনী। মিবা-রের রাণা কুম্ভ যথার্থ বীরপুরুষ। শক্রর রাজ্যে যে কোন প্রকারে বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দেওয়াই প্রকৃত বীরত্বের লক্ষণ নহে, দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যেখানে সেখানে তরবারি আস্ফালন করাও প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় নহে, ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের স্বাধীনতা হরণ করাও প্রকৃত বীরত্বের চিহ্ন নহে। যখন দেখিব, কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি একটি বলিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া গোপনে নিরস্ত্র বিপক্ষকে সংহার করিতেছে, অসময়ে অতর্কিতভাবে অত্যাচারের পরা-কাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বত্র ভয় ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তারে উদ্যত হইতেছে, ন্যায়ের গভীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অন-বরত নর-শোণিত-স্রোতে চারি দিক রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে, তখন আমরা তাহাকে প্রকৃত বীরপুরুষ না বলিয়া গোঁয়ার বা ক্রুর, সাধুজনের এই বিগর্হিত বিশেষণে বিশেষিত করিব। প্রকৃত বীরপুরুষ কখন এমন হীনতা দেখাইতে অগ্র-

সর হন না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা উচ্চভাবে পূর্ণ থাকে। তিনি যুদ্ধস্থলে যেমন বীরত্বের পরিচয় দেন, অন্য সময়ে তেমনি কোমলতা দেখাইয়া সকলকে সম্প্রীত করিতে থাকেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার মহত্ত্ব পার্থিব হীনতার পঙ্কে ডুবিয়া যায় না। ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলেও, আপনার অভীষ্টসাধন জন্য তিনি কখনও ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করেন না, প্রকৃত বীরপুরুষ সর্ব্বদা সংযতভাবে আপনার পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে তৎপর থাকেন। মিবারের রাজপুতগণ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। ইহাঁরা যে বীরত্ব ও মনস্বিতা দেখাইয়া গিয়াছেন, দুর্দ্দান্ত পাঠান, জিগীষু মোগল, বা রাজ্য-লোলুপ ইঙ্গ্রেজ-সেনাপতি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। সাহাবুদ্দীন গোরী চাতুরী অবলম্বন না করিলে. বোধ হয় সহসা দৃষদ্বতী নদীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিত না; আকবর শাহ গভীর নিশীথে গোপনে পরাক্রান্ত জয়মল্লকে হত্যা না করিলে, বোধ হয় চিতোর-রাজ্য সহসা মোগলের হস্তগত হইত না, এবং চিতোরের সহস্র সহস্র লাবণ্যবতী ললনা অনল-কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিত না; লর্ড ক্লাইব গোপনে মিরজাফর ও জগৎশেঠদিগকে আপনার পক্ষে না আনিলে, বোধ হয়, সহসা পলাশীর যুদ্ধে সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদানত হইত না; কাপ্তেন নিকল্‌সন্ ও কাপ্তেন লরেন্স্ ষড়যন্ত্র না করিলে, বোধ হয়, সহসা মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িত না। ভারতবর্ষে অনেক বীরপুরুষ আপনাদের বীরত্ব এইরূপ

কলঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুতের বীরত্বে কখনও এরূপ কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। রাজপুত-বীর সর্ব্বদা অকলঙ্কিতভাবে আপনার অতুল্য বীরত্ব-কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা, আত্ম-সম্মান ও বিশ্বস্ততা রাজপুত-বীরের সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি। এক জন রাজপুতকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ কি? সে তখনি উত্তর করিবে যে, "গুণচোর" ও "সৎচোর" হওয়াই সকলের অপেক্ষা গুরুতর পাপ। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির নাম "গুণচোর" আর অবিশ্বস্তের নাম "সৎচোর।" যে গুণচোর ও সৎচোর হয়, রাজপুতের মতে সে অনন্ত কাল যম-রাজ্যে অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। আমরা মিবারের এইরূপ বীরপুরুষের পবিত্র চরিত্রের কথা বলিব। বীরত্বের রুদ্র মূর্ত্তি ও মাধুর্য্যের কমনীয় কান্তি, কিরূপে একাধারে অবস্থিতি করে, তাহা এই কথায় জানা যাইবে।

প্রথমে রাণা কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের উজ্জ্বলতার পরিচয় দিব। কুম্ভ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাহস, পরাক্রম ও শাসন-দক্ষতায় এই ক্ষত্রিয় বীর মিবারের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুম্ভ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মিবারের সিংহাসনে থাকিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তিনি চিরকাল শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁহাকে একটি পরাক্রান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। খিলিজীবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কয়েকটি মুসলমান-রাজ্য দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হয়। এই সকলের মধ্যে

মালব ও গুজরাট প্রধান। কুম্ভ যখন মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন এই দুই প্রদেশের অধিপতি বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই ভূপতি একত্র হইয়া বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ এক লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া স্বদেশ-রক্ষায় প্রস্তুত হন। মালবের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই মহাযুদ্ধে বিপক্ষদিগের পরাজয় হয়, বীরভূমি মিবারের স্বাধীনতা অটল থাকে। মালবের অধিপতি শেষে কুম্ভের বন্দী হন। এই সময়ে মহাবীর কুম্ভের পবিত্র চরিত্রের সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়। কুম্ভ পরাজিত শত্রুর প্রতি অসৌজন্য দেখাইলেন না। তিনি বীরধর্ম্ম ও বীরপদ্ধতি অনুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অতুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শেষে বিজয়ী হইয়া সেই বীর-ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। কুম্ভ প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় পরাজিত ও পদানত শত্রুর সম্মান রক্ষা করিলেন, তাঁহাকে কেবল বন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন না, প্রত্যুত অনেক ধনসম্পত্তি দিয়া স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। বীরপুরুষের চরিত্র এইরূপ মহত্ত্ব ও উদারতায় পূর্ণ। যখন শিখসেনাপতি শের সিংহের পরাজয় হয়, শিখসর্দ্দারগণ যখন ইঙ্গরেজ-সেনাপতির হাতে আপনাদের তরবারি দিয়া কহেন ;—"ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার প্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়াছি, কখনও আমরা বীরধর্ম্মের অবমাননা করি নাই। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে

চিরনিদ্রিত হইয়াছে, আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র সমস্তই হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে কালও তাহা করিব।" ইঙ্গরেজ-সেনাপতি এই পরাজিত তেজস্বী বীরগণের সম্মান রক্ষা করিলেন না। সে সময়ে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি পঞ্জাবের স্বাধীনতা নষ্ট করিলেন। শিখ-রাজ্যে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িল। যাহারা আহত হইয়া গুজরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-স্রোতে বীরত্বের সম্মান ভাসিয়া গেল। মিবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে আপনার প্রকৃত বীরত্ব রক্ষা করিয়াছিল। রাজপুত-বীরের এই অসামান্য চরিত্রগুণ পৃথিবীর সমস্ত বীরেন্দ্র-সমাজের শিক্ষার বিষয়।

রায়মল্ল।

মিবারের অধিপতি রায়মল্লের চরিত্র দেবভাবে পূর্ণ। এই দেবভাব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি স্বার্থত্যাগের কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, বংশের পবিত্রতার রক্ষার জন্য যদি কোনরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞা থাকে, প্রকৃত বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ যদি হৃদয়ের কোনরূপ তেজস্বিতা থাকে, তাহা হইলে মিবারের রায়মল্ল প্রকৃতপক্ষে এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়াছেন, এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখাইয়াছেন,

এবং এইরূপ তেজস্বিতার বলে আপনার বীরত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দিমস্থিনিস্ অদ্বিতীয় বাগ্মী না হইতে পারেন, বাল্মীকি অদ্বিতীয় কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারেন, হাউয়ার্ড অদ্বিতীয় হিতৈষী বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত না হইতে পারেন, কিন্তু রায়মল্ল তেজস্বীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়। রায়মল্লের ন্যায় কেহই আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইতে পারেন নাই, এবং রায়মল্লের ন্যায় কেহই পাপের রাজ্যে পুণ্যের আলোক ছড়াইয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। জগতের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত আর কোন স্থলে এরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে অক্ষম রহিয়াছে। রোমের ব্রুতস অপরাধী পুত্রকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া জগতের সমক্ষে স্বার্থত্যাগ ও ন্যায়-বুদ্ধির মহান্ ভাব দেখাইয়াছেন, মিবারের রায়মল্ল অপরাধী পুত্রের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

চারি শত বৎসরের কিছু অধিক কাল হইল, বীরভূমি রাজপুতনার একটি লাবণ্যবতী অপূর্ণযুবতী অশ্বারোহণে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। অশ্বারোহিণীর যুদ্ধবেশ; এই বেশে বালিকা অকুতোভয়ে তীরবেগে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। বালিকার সে সময়ের ভীষণ ও মধুর মূর্ত্তি চারি দিকে একটি অপূর্ব্ব প্রভার বিকাশ করিতেছিল। দূর হইতে একটি ক্ষত্রিয় যুবক এই মোহিনী কান্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবকও অশ্বারূঢ় ও যুদ্ধবেশধারী। মধুরে মধুরে মিলন হইল। অপূর্ব্ব ভীষণ ভাবের সহিত ভীষণতা মিশিয়া গেল। অশ্বারূঢ় যুবক অশ্বারোহিণীর অনুপম লাবণ্যরাশি, ইহার উপর অপূর্ব্ব অশ্বচালনা-

কৌশল দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এই স্থির সৌদামিনী, যুবকের হৃদয়ে আশা নিরাশার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। যুবক ইহার ঘাতপ্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। পাঠক! ইহা উপন্যাসের ভূমিকা নহে। লীলাময়ী কল্পনার অপূর্ব্ব কাহিনী নহে। ইহা ইতিহাসের কথা। এই যুবক কে? মিবারের ক্ষত্রকুল-সূর্য্য মহারাজ রায়মল্লের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল। আর বিদ্যুৎ-চঞ্চল অশ্বের আরোহিণী কে? টোডার অধিপতি রাও সুরতনের কন্যা—তারাবাই। বাপ্পারাওর বংশধর আজ এই যুদ্ধ-বেশ-ধারিণী লাবণ্যময়ী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির লাবণ্য-সাগরে মগ্ন হইলেন।

মহারাজাধিরাজ রায়মল্লের পুত্র তারাবাইর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেও রাও সুরতন সহসা তাহার আশা ফলবতী করিলেন না। বীর-ভূমি রাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুত-বীর বাঙ্গালীর ন্যায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকার বাঙ্গালীর ন্যায় ধনশালীর জড়পিণ্ডবৎ অকর্ম্মণ্য পুত্র বা বি, এ, এম্, এ, উপাধিধারী বিলাসী যুবক পাইলেই রাজপুত-বীর আহ্লাদে গলিয়া যায় না। লিল্লা নামে এক জন দুরন্ত পাঠান রাও সুরতনকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া টোডা অধিকার করিয়াছিল। সুরতন নিষ্কাশিত হইয়া কন্যারত্নের সহিত মিবাররাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরে আসিয়া বাস করিতে-ছিলেন। সুরতনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি বাহুবলে টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—তারাবাই তাঁহারই করে সমর্পিত হইবেন। এ প্রতিজ্ঞা রাজপুতের উপযুক্ত। যাঁহারা বসুন্ধরাকে বীরভোগ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন, এ প্রতিজ্ঞা-বাক্য সেই বীরপুরুষদের মুখেই শোভা পায়।

জয়মল্ল রাও সুরতনের দুহিতা-রত্নের অভিলাষী হইয়া টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পাঠানের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু জয়মল্ল সুরতনের কথা রাখিতে পারিলেন না। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পাঠানের পরাক্রমে পরাভূত হইলেও রাজপুত-কলঙ্কের হৃদয়ে কালিমার সঞ্চার হইল না। শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ-স্থলে দেহ ত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে তারার মোহিনী মূর্ত্তি জাগিয়াছিল, তিনি পরাজিত হইলেও অম্লানভাবে বেদনোরে আসিয়া অবৈধরূপে সেই লাবণ্যময়ী ললনাকে অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। এ অপমান রাও সুরতন সহিতে পারিলেন না। রাজপুতের হৃদয় উত্তেজিত হইল। এ উত্তেজনা অমনি অমনি তিরোহিত হইল না। রাও সুরতন জয়মল্লকে হত্যা করিয়া আপনার বংশের সম্মান রক্ষা করিলেন। রাজপুতের অসি রাজপুত-কলঙ্কের শোণিতে রঞ্জিত হইল।

ক্রমে মিবারে এ সংবাদ পঁহুছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এ সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ভয়ানক সংবাদ মহারাজ রায়মল্লকে শুনাইবে কে? বাপ্পারাওর সন্তানের শোণিতে রাও সুরতনের হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে কে? সকলেই ভাবিতে লাগিল, আর সুরতনের পরিত্রাণ নাই। রায়মল্লের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠ সহোদরের পরাক্রমে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র ঔদ্ধত্যপ্রযুক্ত পিতার আদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কেবল এক জয়মল্লই পিতার হৃদয়-রঞ্জন ছিলেন। আজ সেই হৃদয়-

রঞ্জন কুসুম বৃন্তচ্যুত হইল। হায়! আজ নিদারুণ শোকের আঘাতে রায়মল্ল অধীর হইবেন। তাঁহাকে সুস্থির করিবে কে? মিবারের রাজপুত্রেরা ইহা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইল. কথা আর দীর্ঘকাল গোপনে রহিল না, মহারাজ রায়মল্লের কানে গেল। রায়মল্ল ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার ধীরতার ব্যতিক্রম হইল, অকস্মাৎ তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও নেত্রদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রাণাধিক পুত্রের শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। রায়মল্ল অকাতরে বজ্রগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান এইরূপে নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন।" মহারাজ রায়মল্ল ইহা কহিয়া পুত্রহন্তা রাও সুরতনকে ক্ষত্রিয়-কুলোচিত পুরস্কার স্বরূপ বেদনোর রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

প্রকৃত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চ ভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীর এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলঙ্কৃত। এই মহাপ্রাণতা ও এই তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান করিতে পারেন, আজ এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন? আর কি চারণগণ অতীত গৌরবের গীতি গাইয়া চির-নিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না?

বীরবালক ও বীররমণী।

১৭৫৬ অব্দে পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ যখন চিতোর নগর আক্রমণ করেন, স্বাধীনতাপ্রিয় বীরগণ যখন গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অকাতরে রণভূমির ক্রোড়শায়ী হন, রাজপুতকুল-গৌরব জয়মল্ল যখন শত্রুর হস্তে নিহত হন, ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত যখন অসীম উৎসাহে স্বাধীনতার জয়-পতাকা উড়াইয়া শত্রুর সম্মুখে আইসেন, তখন বীরভূমি চিতোরের তিনটি বীরাঙ্গনা স্বদেশের জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া মোগল-সেনার গতি প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই ললনাত্রয় শত্রু-নিপীড়িত রাজস্থানের প্রকৃত বীরাঙ্গনা, স্বাধীনতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি, আত্মত্যাগের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

পরাক্রান্ত জয়মল্ল স্বর্গে গিয়াছেন। অন্যায় সমরে পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। বীরভূমি বীরশূন্য হইয়াছে। চিতোর রক্ষা করিবে কে? দুর্দ্দান্ত মোগল দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বাধা দিবে কে? স্বাধীনতার লীলাভূমি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেছে, এ দুর্ব্বহ নিগড় ভাঙ্গিবে কে? বীরভূমি আজ হতাশ ও হতোদ্যম। এই সময়ে একটি বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। জয়মল্ল জন্মের মত চিতোর হইতে বিদায় লইয়াছেন, তাঁহার অভাবে চিতোর শূন্য হইয়াছে; পুত্ত এই শূন্য স্থান

পূরণ করিলেন। পুত্তের বয়স ১৬ বৎসর। বয়সে তিনি বালক, কিন্তু সাহসে, বিক্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বর্ষীয়ান্ পুরুষ। পুত্ত মাতার নিকট বিদায় লইলেন। কর্ম্মদেবী আশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়তম পুত্রকে যুদ্ধ-স্থলে যাইতে কহিলেন। পুত্ত প্রিয়তমার নিকটে গেলেন, কমলাবতী প্রফুল্লহৃদয়ে প্রাণাধিক স্বামীকে বিদায় দিলেন; ভগিনী কর্ণবতী জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত সহোদরকে উত্তেজিত করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালক—চিতোরের অদ্বিতীয় বীর, জন্মের মত বিদায় লইয়া অসীম উৎসাহে পবিত্র কার্য্য সাধনের জন্য পবিত্র ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। মোগল-সেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। আকবর এক ভাগের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অন্য ভাগ আর এক জন বিচক্ষণ যোদ্ধার অধীনে ছিল, দ্বিতীয় দলের সহিত পুত্তের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সম্রাট্ অপর দিক হইতে পুত্তকে বাধা দিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর। এই সময়ে সহসা আকবরের সৈন্য যুদ্ধস্থলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল; তাহারা পুত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সহসা তাহাদের গতি রোধ হইল। সম্মুখ সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম; গিরিবর্ত্মের পুরোভাগে দুই একটি শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ। এই বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগ হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া মোগল-সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। মোগলেরা স্তম্ভিত হইল। এদিকে অনবরত গুলি আসিতেছিল, অনবরত গুলির আঘাতে সৈন্যগণ রণভূমির ক্রোড়শায়ী হইতেছিল। আকবর সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনটি বীরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। একটি বর্ষীয়সী,

আর দুইটি ঈষৎ উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় অপূর্ণযুবতী। তিনটিই অশ্বে আরূঢ়, তিনটিই দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত এবং তিনটিই শস্ত্রচালনায় সুদক্ষ। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া আকবরের হৃদয় বিচলিত হইল। এই তিনটি বীরাঙ্গনার পরাক্রমে তাঁহার অসংখ্য সৈন্যের গতি রোধ হইয়াছে, ইহাদের অব্যর্থ সন্ধানে বহু সৈন্য রণস্থলে দেহত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট ক্ষোভে, লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

এ দিকে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, তুমুল যুদ্ধে কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী আপনাদের লোকাতীত পরাক্রম দেখাইতে লাগিলেন। ষোড়শবর্ষীয় পুত্ত—স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, প্রবল শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করিবে, ইহা কর্ম্মদেবী স্থিরচিত্তে দেখিতে পারেন না; প্রিয়তম স্বামী—পবিত্র প্রেমের অদ্বিতীয় আস্পদ, একাকী মোগল-শস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, একাকী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য প্রাণ ত্যাগ করিবে, ইহা কমলাবতী প্রাণ থাকিতে সহিতে পারেন না; ভালবাসার ও প্রীতির আশ্রয়ভূমি সহোদর পবিত্র কার্য্যের জন্য দেহ ত্যাগ করিবে, দুরন্ত শত্রু স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইবে, ইহা কর্ণবতী নীরবে দেখিতে পারেন না। পুত্ত মোগলসৈন্যের এক দল আক্রমণ করিয়াছেন; আকবর আর এক দল লইয়া পুত্তের বিরুদ্ধে যাইতেছেন; কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতী, হঠাৎ এই সৈন্যের গতি রোধ করিলেন, তুচ্ছ প্রাণের মমতা ছাড়িয়া কোমল দেহে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া, পবিত্র দেশের পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত্রুর ব্যহভেদে দণ্ডায়মান হইলেন।

এক দিকে ষোড়শবর্ষীয় পুত্র, আর এক দিকে তাঁহার বর্ষীয়সী জননী এবং অপূর্ণবয়স্কা প্রণয়িনী ও সহোদরা। চিতোরের বীর্য্য-বহ্নির এই তিনটী অত্যুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ দিল্লীর সম্রাটের অসংখ্য সৈন্য ছারখার করিতে উদ্যত। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নির্জ্জীব, ভারত আজ বীরত্ব-রহিত, ভারত আজ জাতীয় জীবন-শূন্য। ভারত আজ এ বীরবালক ও বীরাঙ্গনার পবিত্র বীরত্বের পূজা করিবে কি?

ঝটিকা বহিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনটী বীরাঙ্গনার গুলির আঘাতে মোগলসৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনাত্রয় দুরন্ত শত্রুর গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইঁহাদের অস্ত্র-চালনায় অনেক সৈন্য নষ্ট হইল। আকৃবর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি এই তিন বীরাঙ্গনার বীরত্বে স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন। এই বীরত্বের যথোচিত সম্মান করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে এই বীরাঙ্গনা তিনটীকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বহু অর্থ পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। কিন্তু সকলে যুদ্ধে উন্মত্ত, সম্রাটের এ কথায় কোন ফল হইল না। মোগলেরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনটী বীর-রমণী অসীম সাহসে তাহাদের আক্রমণে বাধা দিতে লাগি-লেন। সহসা কর্ণবতীর শরীর অবশ হইল, সহসা কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভূতলে টলিয়া পড়িলেন। কর্ম্ম-

দেবীর দৃক্‌পাত নাই ; প্রাণাধিক দুহিতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া তিনি কাতর হইলেন না,—অকাতরে অবিচলিত হৃদয়ে তিনি শত্রু-পক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একটি গোলা আসিয়া কমলাবতীর বাম হস্তে প্রবেশ করিল। ভীষণ আঘাতে কমলাবতী প্রথম টলিলেন না; স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া শত্রুর সৈন্য নষ্ট করিতে লাগিলেন। মোগলেরা উন্মত্ত, গোলার উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। যখন কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী, উভয়েই ভূতলশায়িনী হইলেন, তখন পুত্ত সম্রাটের সৈন্য পরাজয় করিয়া গিরিবর্ত্মের নিকট আসিলেন। তাঁহার আরাধ্যা জননী, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিকা সহোদরার দেহ পবিত্র যুদ্ধ-স্থলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল। পুত্ত ইহা দেখিলেন, দেখিয়া দুরন্ত মোগল-সৈন্যের অনেককে নষ্ট করিলেন। এ দিকে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবীর বাক্‌রোধ হইয়া আনিতেছিল। পুত্ত বাহু প্রসারিয়া ইঁহাদিগকে তুলিয়া লইলেন। কমলাবতী ধীরভাবে প্রাণকান্তের দিকে চাহিলেন, ধীরভাবে পতিপ্রাণা সাধ্বী সতী প্রাণেশ্বরের বাহুমূলে মাথা রাখিয়া অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবী প্রিয়তম পুত্রকে আবার যুদ্ধ করিতে কহিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের সহিত স্বর্গে আসিতে অনুরোধ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। পুত্ত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ "হর হর" রবে শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহু ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া ষোড়শবর্ষীয় বীর জন্মভূমির ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। পুত্তের দেহ তদীয় প্রণয়িনীর

সহিত এক চিতায় দগ্ধ করা হইল। কর্ম্মদেবী ও কর্ণবতীর দেহ আর এক চিতায় শায়িত হইল। ইহাঁরা অমর-লোকে গমন করিলেন। ভূলোকে ইহাঁদের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় অক্ষরে লেখা রহিল।

বীর-ধাত্রী।
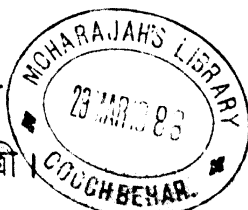
মিবারের বীর-ধাত্রীর অপূর্ব্ব কথা অলৌকিকভাবে পূর্ণ। এই ধাত্রী এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতা ও রাজভক্তি দেখাইয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রাজপুত-কুলগৌরব পরাক্রান্ত সংগ্রামসিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। যিনি সাহসে অবিচলিত ও বীরত্বে অতুল্য ছিলেন, অস্ত্রাঘাতের আশীটি গৌরবসূচক চিহ্ন যাঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, যিনি বিধর্ম্মী যবনদিগের সহিত যুদ্ধে ভগ্নপাদ ও ছিন্নহস্ত হইয়াও আপনার বীরত্ব-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ পঞ্চ ভূতে মিশিয়া গিয়াছে। শত্রুর চক্রান্তজালে পড়িয়া পুরুষসিংহ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। মিবারের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাহার শিশু সন্তান আজ শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে অনভিজ্ঞ ছয় বৎসরের বালক নিশ্চিন্ত মনে আহার পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে; এ দিকে যে দুরন্ত শত্রু তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল অনভিজ্ঞ শিশু

তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সংগ্রামসিংহের দাসী-পুত্র বনবীর মিবারের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। এই ঘোর বিপদ হইতে আর পরাক্রান্ত সংগ্রাম-সিংহের শিশু সন্তান উদয়সিংহকে রক্ষা করিবে কে? বাপ্পা-রাওর পবিত্র বংশ নির্ম্মূল হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ বংশের আজ উদ্ধার করিবে কে? আজ একটি অসহায় রমণী এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে; অনাথ বালক আজ একটি তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না আজ অশ্রুতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগবলে বাপ্পারাওর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিল? কি উপায়ে পিতৃহীন সহায়হীন শিশু অক্ষত শরীরে রহিল? তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে উদয়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে, এমন সময়ে এক জন ক্ষৌর-কার আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া ক্ষৌরকারের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত ক্ষৌরকার সেই চাঙ্গারি লইয়া কোন নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না, নীরবে অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি প্রসা-

রণ করিল. বনবীর উদয়সিংহ বোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই প্রাণ-সংহার করিয়া চলিয়া গেল। এ দিকে রাজবংশীয় কামিনী-গণের রোদন-ধ্বনির মধ্যে সেই ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ধাত্রী নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের প্রেতকৃত্য দেখিয়া ক্ষৌরকারের নিকট গমন করিল।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে অসঙ্কোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশু সন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাণা সংগ্রাম-সিংহের পুত্রের প্রাণ-রক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যু-মুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর মহান্? যে রমণী হৃদয়-রঞ্জন কুসুম-কোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্তব্য সাধনে বিমুখ না হয়, তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বিতার পরিপোষক? আজ এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও মহীয়সী তেজস্বিতার গৌরব বুঝিবে কে? বাঙ্গালী! তুমি ভীরু। প্রকৃত তেজস্বিতা আজও তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। তুমি আজও প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষিতার মহান ভাব বুঝিতে পার নাই। তুমি পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পার। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী ও যথার্থ হিতৈষী পুরুষ এই অসামান্যা ধাত্রীকে আর এক ভাবে চাহিয়া দেখিবে। এই অসাধারণ ভাব সাধারণের আয়ত্ত নয়। অসাধারণ লোকেই ইহার গৌরব বুঝিতে সমর্থ। হায়! আজ ভারতে এইরূপ অসাধারণ লোক কয়টি আছেন? প্রতি-ধ্বনি বিষণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কয়টি আছেন? ভারত আজ নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট। ভারত শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধ অথবা

কূর্ম্মের ন্যায় আজ আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি আবার কহিতেছে, কে ইহার উত্তর দিবে?

প্রতাপসিংহের বীরত্ব।

আজ ১৬৩১ সংবতের ৭ই শ্রাবণ। আজ মিবারের রাজপুরুষগণ 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমির জন্য আপনাদের প্রাণ দিতে উদ্যত। সম্রাট্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম রাজা মানসিংহের সহিত মিবার অধিকার করিতে আসিয়াছেন। বিধর্ম্মী যবন, পবিত্র সূর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা দিতে উদ্যত হইয়াছে, মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আজ এই বংশ অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত। প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীর আজ প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। চিরস্মরণীয় হলদিঘাটে চৌহান, রাঠোর, ঝালাকুলের বাইশ হাজার রাজপুত বীর একত্র হইয়াছে, প্রতাপসিংহ এই বাইশ হাজার রাজপুতের অধিনেতা হইয়া পরাক্রান্ত মোগল-সৈন্যের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছেন।

হলদিঘাট একটি গিরিবর্ত্ম। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, প্রায় সকল দিকেই সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। প্রতাপ

সিংহ এক গিরিবর্ত্ম আশ্রয় করিয়া আকবর-তনয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের দিন, রাজপুত বীরের অনন্ত উৎসবের দিন। রাজপুতগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল এবং একে একে এই উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। এই উৎসবে মহাবীর প্রতাপসিংহ সকলের আগে ছিলেন। তিনি প্রথমে আম্বের-রাজ মানসিংহের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু মানসিংহ দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ সে সৈন্য ভেদ করিতে পারিলেন না; মেঘ-গম্ভীর স্বরে মানসিংহকে কাপুরুষ, রাজপুত-কুলাঙ্গার বলিয়া তিরস্কার করিলেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপের এ তিরস্কারে কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর যুবরাজ সেলিম হস্তীতে আরোহণ করিয়া যে দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন, প্রতাপ সেই দিকে অসি-চালনা করিলেন। এক এক আঘাতে সেলিমের দেহ-রক্ষকগণ ভূমিশায়ী হইতে লাগিল। হস্তীর মাহুত প্রাণ ত্যাগ করিল। প্রতাপ নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তিন বার মোগল-সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন বার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুতগণ আপনাদের প্রাণ দিয়া তাঁহাকে তিন বার এই আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। রাণার প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা আত্মপ্রাণ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শরীরের এক স্থানে গুলির আঘাত, তিন স্থানে বড়শার আঘাত, এবং তিন স্থানে অসির আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি এইরূপে সাত স্থানে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি উন্মত্ত ভাবে শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতগণ আবার তাঁহার উদ্ধা-

রের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের অনেকে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। চৌহান, রাঠোর, ঝালা-কুলের প্রায় সকলেই গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষার জন্য অসি হস্তে করিয়া অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল; প্রতাপকে উদ্ধার করা এ বার অসাধ্য বোধ হইল। দৈলবারার বীরমল্ল ইহা দেখিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার সৈন্য লইয়া প্রতাপের দিকে ধাবমান হইলেন। এ বার মোগলের ব্যূহ ভেদ হইল। প্রতাপসিংহ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরমল্ল ফিরিলেন না। প্রভুর জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণভূমির ক্রোড়-শায়ী হইলেন। প্রতাপ বীরমল্লের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দৈলবারা! আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিলেন।" আসন্ন-মৃত্যু দৈলবারা অস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "রাজপুত বীরধর্ম্ম জানে। বিপৎকালে মহারাণাকে ত্যাগ করে না।" মোগল-সৈন্য রাজপুতের বিক্রম দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজপুতের জয়লাভ হইল না। মোগল-সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় চারি দিকে ছাইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা হটিল না। চৌদ্দ হাজার রাজপুতের শোণিতে হলদিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে হলদিঘাটের সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট রক্ষার্থ অম্লান-বদনে, অসঙ্কুচিত-চিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হলদিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্ত কাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্র-সমাজে

হৃদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়া, অনন্তকাল অমর-শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপসিংহ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামে নীলবর্ণ তেজস্বী অশ্ব-আরোহণে রণস্থল ত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাতে ধাবিত হয়, তখন চৈতক লম্ফ প্রদানে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধ-স্থলে আহত হইয়াছিল। আহত স্বামীকে লইয়া এই আহত বাহন চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ প্রতাপ পশ্চাতে অশ্বের পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শক্ত আসিতেছেন। শক্ত প্রতাপের শত্রু, তিনি ভ্রাতৃধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের সহিত মিশিয়াছিলেন। প্রতাপ এই ক্ষত্রকুলের কলঙ্ক সহোদরকে দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে অশ্ব স্থির করিলেন। কিন্তু শক্ত কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না। তিনি হলদিঘাটে জ্যেষ্ঠের অলৌকিক সাহস ও ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, স্বদেশীয়গণের স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে তাঁহার মনে আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এখন আর ক্ষত্রিয়-শোণিত অপবিত্র না করিয়া সজলনয়নে জ্যেষ্ঠের পদানত হইলেন। প্রতাপ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। বহু দিনের শত্রুতা অন্তর্হিত হইল। প্রতাপ প্রগাঢ় স্নেহে কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিলেন। এখন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া মিবারের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এ দিকে পথে চৈতকের প্রাণ

বিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আজ পর্য্যন্ত এই স্থান "চৈতক্‌কা চবুতর" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হলদিঘাট মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত-স্রোতে প্রক্ষালিত হয়। এ দিকে সেলিম বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল; প্রতাপ সন্তানবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর আসিতে লাগিল; তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না। প্রতি নূতন বৎসর নূতন নূতন কষ্ট সঙ্গে করিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপ অটল রহিলেন, মোগলের অধীনতা স্বীকার করিলেন না। ক্রমে মিবারের আকাশ অধিক অন্ধকারময় হইতে লাগিল, ক্রমে পরাক্রান্ত শত্রু অনেক স্থানে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিল, তথাপি প্রতাপ অটল রহিলেন, বাপ্পারাওর শোণিত কলঙ্কিত করিলেন না। এই সময় প্রতাপসিংহ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ তাঁহার পরিবারবর্গকে একটি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া আহার দিয়া, তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে মহাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান রাজকর্ম্মচারী ঈদৃশী দেশ-হিতৈষণায় বিমোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধনে

পূর্ব্বক এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের সমুদয় রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রু-রও প্রশংসাভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানদিগের কষ্ট এক এক সময় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পাঁচ বার খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরি-ত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়নপর হন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ মলনামক ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময় ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটি দুহিতা এই অবশিষ্ট রুটীখানি খাইতেছিল, এমন সময়ে একটি বন্য বিড়াল তাহার হস্ত হইতে সেই রুটী কাড়িয়া লয়। বালিকা কাঁদিয়া উঠে; প্রতাপ অদূরে অর্দ্ধশয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার রোদনে চমকিত হইয়া দেখেন, রুটীখানি অপহৃত হইতেছে। বালিকা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত স্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লান-বদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান-রক্ষার্থ আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লান-বদনে রাজপুত বংশের গৌরব-রক্ষার জন্য রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহার-মূর্ত্তির বিভী-

বিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এক্ষণে তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাতর স্বরে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল, যেন শত শত কাল ভুজঙ্গ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল. প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের এই অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগর মধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকট যে পত্র পাঠাইলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বজাতি-হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনত-মস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে কয়েকটি কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকট পাঠাইলেন;—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশা ভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন সে সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর এক জন ব্যবসায়ী ; তিনি সকলই কিনিয়াছেন, কেবল

উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলই হতাশ্বাস হইয়া নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই ব্যবসায়ী কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না, এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে এই বীজ রক্ষা পাইতে পারে, যাহাতে ইহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার সমুজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।”

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজপুতের তুল্য বল-কারক হইল। ইহা প্রতাপের মুহ্যমান দেহে জীবনী শক্তি দিল, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর বৃহৎ কার্য্য সাধনে সমুত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বত-কন্দরে থাকিতে পারিলেন না; মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধু নদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত ধন আনিয়া,প্রতাপের নিকট উপস্থিত করেন।

এই সম্পত্তি এত ছিল যে, ইহা দ্বারা বার বৎসর পঁচিশ হাজার ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল, প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া আরাবলী অতিক্রম করিলেন। মোগল-সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওয়ীরে ছিলেন, প্রতাপ প্রবল বেগে আসিয়া মোগল-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। দেওয়ীরের যুদ্ধে প্রতাপের জয়লাভ হইল। শাহবাজ খাঁ হত হইলেন। ক্রমে কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার প্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। এই বিজয়-বার্ত্তা আকবর শুনিলেন। পরাক্রান্ত মোগল দশ বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়-লক্ষ্মী অধিকার করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেওয়ীরের যুদ্ধে তাহা আপনার করায়ত্ত করিলেন। ইহার পর মোগল-সৈন্য মিবারে আর উপস্থিত হইল না। প্রতাপের বিজয়-লক্ষ্মী অটল থাকিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতশিখরে উঠিলেই তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গপ্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন। যে চিতোরে বাপ্পারাওর জীবিত-কাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুত-কুল-গৌরব সমর সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ দৃষদ্বতী নদীর তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লানবদনে—অমুক্ত-

হৃদয়ে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর শ্মশান, আজ সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈল-শ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তা—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্রই তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে আপনাদের দুর্গতির সময় ঝড় বৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ নিরতিশয় সৌখীন যুবক, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহ্য হইবে না। পুত্রের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না। এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার এই কষ্ট দেখিয়া প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বাহির হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ

নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন; নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

এইরূপে ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোক প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারের থিউকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে "পেলপনিসসের সমর"* অথবা "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" † কখনও এই রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুর ভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুত-

* গ্রীসের দুইটি নগর—স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়া-পরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাতে স্পার্টার সহিত এথিনার তিনটি সংগ্রাম হয়। ইহাই "পেলপনিসসের যুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

† পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়ুস লোকান্তরগত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, গ্রীক-সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশল সহকারে স্বদেশে

পূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত উন্নতাকাঙ্ক্ষ সহায়-সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এজন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন স্বদেশ-হিতৈষিতা রাজপুতের মনে অঙ্কিত থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তৎসমুদয়ের বিবরণ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয় এবং নয়ন-জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্যপরম্পরা রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোন ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই; কোনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন

প্রত্যাগত হন। ইহাই "দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন" বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক-সেনাপতি ও ইতিহাস-লেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

নাই। আরাবলী পর্ব্বতমালার সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। চিরকাল এই গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া, রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে। ভারত মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও ইহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র অভ্রস্পর্শী শৃঙ্গপাতেও ইহা বিচূর্ণ হইবে না।

আত্ম-ত্যাগ।

আমরা ধীরে ধীরে মিবারের বীরপুরুষ ও বীর-রমণীর তেজস্বিতার অলন্ত দৃষ্টান্ত পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের অপ্রাধান্য প্রতিহত রাখিয়াছে? তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ শত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার

সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। তাঁহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাঁহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাঁহাদের পুরোহিত-(ড্রুইড্)-গণের প্রাধান্য সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক বার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে,—কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পর-হস্ত-গত হইয়াছে, অনেক সৈন্য পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কাল-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে,—মিবার আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখান নাই; মিবারের বীররমণী সংগ্রাম-স্থলে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই; মিবারের বীরবালক গরীয়সী জন্মভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই; মিবারের বীরধাত্রী স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশু পুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রভুর বংশ রক্ষায় পরাঙ্মুখ হয় নাই; মিবারের অধিপতি আপনার হৃদয়রঞ্জন তনয়ের হত্যাকারীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন, ন্যায়ের

পবিত্র রাজ্যে পাপের কালিমা ছড়াইতে উদ্যত হন নাই; মিবারের কুলপুরোহিত রাজবংশের মঙ্গলের জন্য অম্লানবদনে স্বীয় হস্তে স্বীয় জীবন নষ্ট করিয়াছেন, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য রক্ষায় কাতর হন নাই। ব্রিটিশ-ভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

কুলপুরোহিতের এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের কথা অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে পূর্ণ। যদি জগতে কোনরূপ নিঃস্বার্থপরতা থাকে, তাহা হইলে এই পুরোহিত তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি, যদি কোনরূপ উদার মহান্ ভাবের আশ্রয়-স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা এই পুরোহিতের হৃদয়। মিবার যথার্থ এ আত্ম-ত্যাগ-গরিমার লীলা-ভূমি। আর কোন ভূখণ্ড এ অংশে মিবারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। নিজের জীবন দিয়া পরের জীবন রক্ষা করা নিঃসন্দেহ অলৌকিক কাজ। মিবারের পুরোহিত এই অলৌকিক কাজ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এ নশ্বর জগতে, এ জীবলোকের ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণিক বিকাশে, কাহারও সহিত এই "দান-বীরের" তুলনা সম্ভবে না।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একদা দুইটি ক্ষত্রিয়যুবক মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। যুবকদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত কোনরূপ বৈষম্য নাই। উভয়ের দেহই বীরত্ব-ব্যঞ্জক। উভয়েই সুগঠিত, সুশ্রী ও যৌবন-সুলভ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ। এই তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তির সহিত একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের শীতল আলোক উভয়ের মুখমণ্ডলেই বিকাশ পাইতেছিল। যুবকদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সদ্ভাব ছিল। দীর্ঘকাল উভয়েই প্রীতির আদান প্রদানে সুখানুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু মিবারের

মৃগয়া-ভূমিতে হঠাৎ এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম হইল, হঠাৎ প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। যুবকদ্বয় কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। এই দুইটি তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর, মহারাণা উদয় সিংহের পুত্র। একটির নাম প্রতাপ সিংহ, অপরটির নাম শুক্ত। একটি অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া এবং চিরকাল স্বাধীনতার উপাসনা করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, অপরটি স্বদেশী স্বজাতির শোণিতে আপনার বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ করিয়াছেন। একটি জাতীয় গৌরবের জীবন্ত মূর্ত্তি, অপরটি জাতীয় কলঙ্কের আশ্রয়-ভূমি। আজ এই তেজস্বী ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে বিরোধ ঘটিল। আজ ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইবার সূত্রপাত হইল। যে বীরত্ব ও তেজস্বিতা একত্র থাকিলে মিবারের গৌরব-সূর্য্য উজ্জ্বলতর হইতে পারিত, হায়! আজ তাহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার বল-ক্ষয় করিল।

প্রতাপ সিংহ মহারাণা উদয় সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং মিবারের গদি তাঁহারই হস্তগত হইয়াছিল। উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শুক্ত, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তেজস্বিতা ও কঠোরতায় শুক্ত কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। একদা একখানি তরবারি প্রস্তুত হইয়া আসিলে উহাতে ধার আছে কি না, জানিবার জন্য কতকগুলি মোটা সূতা একত্র ধরিয়া তরবারির আঘাতে উহা দ্বিখণ্ড করিবার প্রস্তাব হয়। শুক্ত নিকটে ছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবে কহিয়া উঠিলেন, "যে তরবারি অতঃপর মাংস অস্থি ছেদন করিবে, সূতা কাটিয়া তাহার পরীক্ষা করা উচিত নহে।" শুক্ত ইহা কহিয়াই পূর্ব্বের

ন্যায় গম্ভীরভাবে তরবারি লইয়া নিজের অঙ্গুলিতে আঘাত করিলেন। আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। এই সময় শুক্তের বয়স পাঁচ বৎসর। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু যে সাহস ও তেজস্বিতা দেখাইয়াছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত সে সাহস ও তেজস্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর যে বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহা শুক্তের হৃদয় হইতে দূর হয় নাই। প্রতাপ সিংহও কনিষ্ঠের উপর জাতক্রোধ ছিলেন। কিছুতেই এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ তিরোহিত হইল না। কিছুতেই আর পূর্ব্বতন সদ্ভাব ও প্রীতি আসিয়া উভয়কে একতা-সূত্রে বাঁধিতে পারিল না। ক্রমে এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে উভয়ে উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। একদা প্রতাপ সিংহ চক্রাকার অস্ত্র-ক্রীড়া-ভূমিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে শাণিত বড়শা দীপ্তি পাইতেছিল। তিনি এই ক্রীড়া-ভূমিতে আপনার অস্ত্রচালনার কৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে শুক্ত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীর স্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "আজ এই ক্রীড়া-ভূমিতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে, আজ দেখিব, শাণিত বড়শা চালনায় কাহার অধিক ক্ষমতা আছে।" শুক্ত হঠিলেন না, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আয়োজন হইলে তিনি গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "তুমি কি আরম্ভ করিবে?" অবিলম্বে উভয়ে বড়শা লইয়া উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। মিবারের আশা-ভরসা-স্থল তেজস্বী বীরযুগলের জীবন আজ সংশয়-দোলায় আরোহণ করিল। ঠিক এই সময়ে উভয় ভ্রাতার মধ্যে একটি কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব

হইল। সমাগত পুরুষ তেজস্বিতা ও মধুরতা উভয়েরই আশ্রয়-স্থল,—উভয়ই তাঁহার দেহ-লক্ষ্মীকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছিল। সাহসী পুরুষ ধীরভাবে বিরাট-পুরুষের ন্যায় যুদ্ধোদ্যত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। এই মাধুর্য্যময় তেজস্বী পুরুষ মিবারের পবিত্র কুলের মঙ্গল-বিধাত্রী দেবতা। পবিত্র কুল-পুরোহিত আজ দুই ভাইর যুদ্ধ-নিবারণে উদ্যত, আজ দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুইয়ের জীবন-রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প। পুরোহিত ধীরে গম্ভীর-স্বরে এই দুই ভাইকে কহিলেন, "এ ক্রীড়াভূমি, প্রকৃত যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের শাণিত বড়শা শত্রুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক, তোমাদের তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-তরঙ্গিণীতে সন্তরণ করুক। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না। মহাপুরুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন ভ্রাতার পবিত্র অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।" কিন্তু পুরোহিতের এ কথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল উভয়ে উভয়ের জীবন-সংহারে সমুখিত হইলেন। শাণিত বড়শা পূর্ব্বের ন্যায় উভয়ের হস্তে দীপ্তি পাইতে লাগিল। পবিত্র-কুলের হিতার্থী পবিত্রস্বভাব পুরোহিত ইহা দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ও লোচনদ্বয় দীপ্তিময় হইল, মুহূর্ত্তমাত্র তিনি কি যেন চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। নিমেষ মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া আপনার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। মিবারের মঙ্গলবিধাত্রী কুল-দেবতা

মৃত্যোন্মুখ ভ্রাতৃযুগলের প্রাণ রক্ষার জন্য অকাতরে অম্লানভাবে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

প্রতাপ সিংহ ও শুক্ত ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গ অবশ ও হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শব তাঁহাদের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার পবিত্র শোণিত তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপ সিংহ মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। মহান্ আত্মত্যাগের মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইল। প্রতাপ হস্তোত্তোলন করিয়া তীব্রস্বরে আপনার কনিষ্ঠকে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে কহিলেন। শুক্ত জ্যেষ্ঠের আদেশের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল-সম্রাট আকবরের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে আবার প্রণয় স্থাপিত হইতেছিল। সেই মিবারের থর্ম্মাপলীতে—হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে শুক্ত জ্যেষ্ঠের অসামান্য সাহস, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য লোকাতীত পরাক্রম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; যুদ্ধের অবসানে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের পদানত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন; দুই জন আবার প্রীতি-ভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

বীরবালা।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী অনন্ত কালের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। পরাধীন পরপীড়িত ভারতবর্ষ দুরন্ত তিমুর লঙ্গের আক্রমণে মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হইয়াছে। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ তগলক জীবন্মৃতের ন্যায় এই মহাশ্মশানের এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার প্রভাব সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছে। তাঁহার রাজধানী মহানগরী দিল্লী নিষ্ঠুর আক্রমণকারীর অশ্রুত-পূর্ব্ব অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতের এই দুর্দ্দশার সময়ে বীরভূমি রাজস্থান আপনার চিরন্তন বীরত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত রহিয়াছিল। রাজস্থানের বীরবালা আপনার অসাধারণ চরিত্রগুণ এবং অসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া পতির উদ্দেশে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীরভূমির এই তেজস্বিনী বীরবালার নাম কর্ম্মদেবী।

রাজস্থানে যশলমীর নামে একটি জনপদ আছে। এই জনপদ মরুভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহার চারি দিকে বিশাল বালুকা-সাগর নিরন্তর ভীষণভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া পথিকের হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। প্রকৃতির এই ভীষণ রাজ্যে কেবল যশলমীর শ্যামল তরুলতায় পরিশোভিত হইয়া বাসন্তী লক্ষ্মীর মহিমা বাড়াইয়া দিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশলমীরের অন্তর্গত পুগল নামক ভূখণ্ডে অনঙ্গদেব আধিপত্য

করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাধু। ভট্টিজাতির মধ্যে সাধু সর্ব্বপ্রধান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাহস, তাঁহার ক্ষমতা এবং তাঁহার বীরত্বের নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিত। তিনি বিশাল মরুভূমি হইতে সিন্ধু নদের তট পর্য্যন্ত আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কেহই পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আত্ম-প্রাধান্য ঘোষণা করিতে পারিত না। পূগল-কুমার এইরূপে ভীষণ মরুভূমির মধ্যে অসীম প্রতাপ ও অবিচলিত সাহসের সহিত স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল রাখিয়াছিলেন।

একদা সাধু জনপদ-বিজয়-প্রসঙ্গে কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বহুসংখ্য অশ্ব, উষ্ট্র ও সৈন্যের সহিত অরিন্ত নগরে উপনীত হইলেন। অরিন্ত নগর মহিলবংশীয় মাণিকরাওর রাজধানী। মাণিকরাও ১,৪৪০ খানি গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তিনি আদরের সহিত পূগল-কুমারকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাধুও প্রসন্নচিত্তে মহিল-রাজের অতিথি হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বীরত্ব-মহিমা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সৌন্দর্য্য-লীলাময়ী উদ্যান-লতা সুদৃঢ় আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করিল। মহিল-রাজ মাণিকরাওর দুহিতা কর্ম্মদেবী সাধুর গুণ-পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিলেন। রাঠোর-বংশীয় মন্দোর-রাজকুমার অরণ্যকমলের সহিত মহিল-রাজকুমারী কর্ম্মদেবীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কর্ম্মদেবীর ইচ্ছা হইল না। পূগল-রাজকুমারের অতুল বীরত্ব ও সাহসের কাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, এখন তিনি সেই বীরবরের বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনির্ব্বচনীয় দৃঢ়-

তার পরিচয় পাইলেন। বীরবালা এ পবিত্র বীর-কীর্ত্তির অবমাননা করিলেন না, অরণ্যকমলকে অতিক্রম করিয়া মরুভূমি-বিহারী পুরুষসিংহের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক হইলেন।

সাধু এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। অরণ্যকমলের ভয়ে তাঁহার নির্ভয় হৃদয়ে কিছুমাত্র আতঙ্কের আবির্ভাব হইল না। তিনি আপনার সাহস ও বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া এই লাবণ্যবতী কামিনীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। যথাসময়ে বিবাহের দিন অবধারিত হইল। যথাসময়ে মাণিকরাও স্বীয় রাজধানী অরিন্ত নগরে দুহিতা-রত্ন সাধুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যান-শোভিনী নবীন-লতা আরণ্য তরুবরকে আশ্রয় করিয়া, তাহার দেহ-লক্ষ্মীর গৌরব বাড়াইল।

এ বিবাহে অরণ্যকমলের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তাঁহার হতাশ হৃদয় হইতে আশার সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। যে কল্পনা তাঁহার সম্মুখে ধীরে ধীরে সুখের, শান্তির ও প্রীতির রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা অতর্কিতভাবে কোথায় যেন মিশিয়া গেল। অরণ্যকমল প্রতিহিংসার কঠোর দংশনে অধীর হইলেন। আশার সম্মোহন দৃশ্যের স্থলে, মোহিনী কল্পনার অনন্ত উৎসবময় রাজ্যের পরিবর্ত্তে অরণ্যকমল হিংসার তীব্র হলাহলপূর্ণ বিকট মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিছুতেই এ সাধনা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইবেন না। যত দিন ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, প্রতিজ্ঞা

করিলেন, তত দিন প্রতিদ্বন্দ্বী সাধুকে নির্জ্জিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। বিধাতার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি অপূর্ণ-বিকশিত কামিনী-কুসুম লাভে বঞ্চিত হওয়াতে অরণ্যকমলের হতাশ হৃদয় এইরূপ কালীময় হইয়াছিল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, দৃঢ় সঙ্কল্প তাঁহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্রত সাধনে উত্তেজিত করিয়াছিল। সাধুর ভবিষ্য সুখের পথ এইরূপে কণ্টকিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল।

অরিন্ত-রাজ জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ বহুমূল্য মণি মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র, একটি স্বর্ণময় বৃষ এবং তেরটি কুমারী দিয়া স্নেহসহকারে বিদায় করিলেন। তিনি জামাতার সঙ্গে চারি হাজার মহিল-সৈন্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু ইহাতে অমত প্রকাশ করিয়া সাত শত মাত্র ভট্টি-সেনা এবং আপনার অসাধারণ সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই নবপরিণীতা প্রণয়িনীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শেষে অরিন্তরাজের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে পঞ্চাশ জন মাত্র মহিল-সৈন্য সঙ্গে লইতে হইল। কর্ম্মদেবীর ভ্রাতা মেঘরাজ এই সৈন্যের অধিনেতার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সকলে অরিন্ত নগর হইতে যাত্রা করিল। সকলে একই উৎসব ও একই আহ্লাদের স্রোতে ভাসিয়া পূগল নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে চন্দননামক স্থানে সাধু যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে মরুভূমির ধূলিরাশি উড়াইয়া এক দল সৈন্য প্রবল বেগে তাঁহার অভিমুখে আসিতে লাগিল। সৈন্যদল দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করিল। দেখিতে দেখিতে মহাদর্পে সাধুর বিশ্রাম-ভূমির সম্মুখবর্ত্তী হইল। সাহসী সাধু চাহিয়া দেখি-

লেন, বহুসংখ্য সৈন্য তাঁহার নিকট আসিতেছে। অরণ্য-কমল মহা-আক্রোশে তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছেন। দেখিবামাত্র সাধু ধীর-ভাবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ধীরভাবে আপনার সৈন্যদিগকে আত্মবিসর্জ্জন অথবা বিজয়লক্ষ্মী অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে চারি হাজার রাঠোর-সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী তেজস্বী অরণ্যকমল তদীয় শোণিত-জলে স্বীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিতর্পণ জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহাতে সাধু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া কিছুমাত্র আত্ম-চাপল্যের পরিচয় দিলেন না। বীরত্বাভিমানী বীরযুবক বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চারি হাজার রাঠোর-সৈন্য মহাবিক্রমে ভট্টিসেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সাহসী রাঠোরগণ সংখ্যায় অধিক ছিল, তাহারা অল্পসংখ্যক ভট্টি-সেনাকে একবারে আক্রমণ করিল না। এরূপ আক্রমণে তাহারা সর্ব্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করিত। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীতে প্রতিদ্বন্দ্বীতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুহুর্ম্মুহুঃ আক্রমণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিল। ১৪০৭ খ্রীঃ অব্দে রাজস্থানের মরুপ্রান্তরবর্ত্তী চন্দন নামক ভূখণ্ডে লাবণ্যবতী রাজপুত-বালার জন্য এইরূপে দলে দলে যুদ্ধ হইল। অবশেষে সাধু অশ্বারূঢ় হইয়া সমর-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তিনি দুই বার অস্ত্র সঞ্চালন করিতে করিতে পরাক্রান্ত রাঠোর-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দুই বার তাঁহার অস্ত্রাঘাতে বহুসংখ্য রাঠোর বীর-শয্যায় শয়ন করিল।

অসময়ে অতর্কিতভাবে এইরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কর্ম্মদেবী ভীত হন নাই, আশঙ্কার তীব্র দংশনে আত্ম-বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার সুখদুঃখের অদ্বিতীয় অবলম্ব—প্রাণাধিক স্বামী বহুসংখ্য শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন, প্রিয়তমের জীবন সংশয়-দোলায় অধিরূঢ় হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মদেবী কাতর হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত প্রিয়তমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের অদ্ভুত সমর-চাতুরী ও অদ্ভুত সাহস দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সাধুর পরাক্রমে ছয় শত রাঠোর সমর-ভূমির ক্রোড়শায়ী হইল, সাধুরও প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য অনন্ত-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কর্ম্মদেবী পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে রহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে স্বামীকে কহিলেন, "আমি তোমার রণ-পার-দর্শিতা দেখিব, তুমি যদি রণশায়ী হও, আমিও তোমার অনু-গামিনী হইব।" সাধু বালিকার অপরিস্ফুট কুসুম-সুকুমার দেহে এইরূপ অসাধারণ তেজস্বিতা ও অটলতার আবির্ভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন, এবং অপরিসীম প্রীতির সহিত স্নেহমাখা দৃষ্টিতে বালিকার এই তেজস্বিতার সম্মান করিয়া, অরণ্যকমলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। অরণ্যকমল এই যুদ্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন, এখন প্রতিদ্বন্দ্বীর শোণিতে আপনার অসম্মানের চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে সাধুর সম্মুখীন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল উভয়ে উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন,—এ পবিত্র যুদ্ধে প্রতারণার আবেশ নাই, চাতুরীর পঙ্কিল ভাব নাই—অধর্ম্মের ছায়াপাত নাই—তেজস্বী ক্ষত্রিয়-যুবকদ্বয় আত্মপ্রাধান্য, আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য মুহূর্ত্তকাল উভয়ে

উভয়কে শীলতার সহিত সম্ভাষণ করিয়া অসি উত্তোলন করিলেন। অস্ত্রের সংঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিল। সাধু অরণ্যকমলের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিলেন, অরণ্যকমলও সাধুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুদ্বেগে স্বীয় অসি চালনা করিলেন। কর্ম্মদেবী দেখিলেন, তাঁহার প্রাণেশ্বরের মস্তকে অসি নিপতিত হইয়াছে। যুবকদ্বয় অচৈতন্য হইয়া যুদ্ধ-স্থলে পড়িয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অরণ্যকমলের চেতনা লাভ হইল। কিন্তু সাধু আর এ নিদ্রা হইতে উঠিলেন না। তেজস্বী পূগল-কুমার তেজস্বিতার সম্মান রক্ষার জন্য অকাতরে, অম্লানভাবে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কর্ম্মদেবীর সমস্ত আশাভরসা ফুরাইল, যে কল্পনার তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে তেজস্বিনী বালা পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে পূগলে আসিতেছিল, তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্ধান করিল। বালিকার প্রাণের অধিক ধন আজ ভীষণ মরু-প্রান্তরে অপহৃত হইল। কিন্তু কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতর হইলেন না। তিনি ধীরভাবে অসি গ্রহণ করিলেন, এবং ধীরভাবে উহা দ্বারা নিজ হাতে নিজের এক বাহু কাটিয়া কহিলেন, এই বাহু প্রিয়তমের পিতাকে দিয়া যেন বলা হয়, তাঁহার পুত্রবধূ এইরূপই ছিল। তিনি আর এক বাহুও এই ভাবে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কর্ম্মদেবী এই ছিন্ন বাহু তাঁহার বিবাহের মণি-মুক্তার সহিত মহিল-কবিকে উপহার দিতে কহিলেন। অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে চিতা প্রস্তুত হইল। পতিপ্রাণা সাধ্বী বালা প্রাণাধিক ধনকে বুকে রাখিয়া প্রশান্তভাবে জ্বলন্ত অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে

পরিণত হইয়া গেল, কিন্তু তদীয় পবিত্র কীর্ত্তির বিলয় হইল না। তেজস্বিনী বীরবালা অপূর্ব্ব চরিত্রগুণ ও অসাধারণ পতি-ভক্তি দেখাইয়া অনন্ত কীর্ত্তির মহিমায় অমরী হইয়া রহিলেন।

কর্ম্মদেবীর ছিন্ন বাহু যথাসময়ে পূগলে পঁহুছিল। বৃদ্ধ পূগলরাজ উহা দগ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। দাহস্থলে একটি পুষ্করিণা খনিত হইল। এই পুষ্করিণী "কর্ম্মদেবীর সরোবর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। অরণ্যকমলের ক্ষত স্থান ভাল হইল না। ছয় মাসের মধ্যে তিনিও সাধুর অনুগমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।

Printed at the Vina Press,—Calcutta.

পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আর্য্যকীর্ত্তি।

(শিখ।)

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ও

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৬

বিজ্ঞাপন।

সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে গত ৩০এ মার্চ্চ আমি উক্ত কলেজ-গৃহে শিখদিগের উৎপত্তি ও উন্নতির সম্বন্ধে যে বক্তৃতা পাঠ করি, তাহা এখন কিয়দংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আর্য্য-কীর্ত্তির কাহিনী একবার পড়িয়া দেখিলেই আমি চরিতার্থ হইব।

এই স্থলে আমি সিটি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকটে যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি উৎসাহ না দিলে, বোধ হয়, এই বক্তৃতা প্রচারিত হইত না।

কলিকাতা।
১৮ই বৈশাখ, ১২৯০

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

আর্য্যকীর্ত্তি।

(শিখ।)

শিখদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

শিখদিগের বিবরণ ইতিহাসের একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। যখন ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, যখন ভারতবর্ষ পরাধীনতাশৃঙ্খলে দৃঢ়তর আবদ্ধ, তখন কে মনে করিয়াছিল, সেই পরাধীনতার সময়ে ভারতের একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বিষয়-নিস্পৃহ তপস্বীর ন্যায় ধীরে ধীরে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া, পরিশেষে প্রতাপশালী প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে? সে সলিল-রেখা একটি সূক্ষ্ম রজতমালার ন্যায় পৃথিবীর দেহের একাংশে শোভা পাইতেছিল, কে মনে করিয়াছিল, কালে তাহা ভীষণ আবর্ত্তময়ী মহাতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া জীবলোকের শক্তিকে উপহাস করিতে করিতে বেগে ধাবমান হইবে, এবং আপনার ক্ষমতায় আপনিই উন্মত্ত হইয়া তরঙ্গ-বাহুর আঘাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে? কালের পরাক্রমে শিখসম্প্রদায়ে ঐরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। লোকে প্রথমে যাহাকে বিস্ময়-স্তিমিতনেত্রে একবার চাহিয়াও দেখে নাই, কালে সে

সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লু বিজয়ি ব্রিটিশ তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়া বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়াছে। এই প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎপত্তির পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল, এস্থলে তৎসমুদয়ের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। রোমক সাম্রাজ্যের পতন অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনাসমূহ রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে মুসলমানেরা উদ্বেল সাগরের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহুকাল পূর্ব্বে পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল. কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই, বাহ্লীকের গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই, আরবগণও একবার দলবলসহ উপস্থিত হইয়া সিন্ধু-দেশে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমের মৃত্যুর পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত থাকে নাই। কিন্তু খ্রীঃ ১০০০ অব্দে যেরূপ দৌরাত্ম্য সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ বিব্রত হইয়া পড়ে। সুলতান মহমুদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধন-সম্পত্তি দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। মথুরার প্রাসাদের আদর্শে গজনি নগর

শোভিত হয় এবং সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড কবাট গজনির মাহাত্ম্য বিকাশ করে। এপর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থ বিলুণ্ঠনেই ব্যাপৃত ছিল, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তাদৃশ যত্ন করে নাই। কিন্তু মহাম্মদ গোরী মধ্যএসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহমুদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। হিন্দু আর্য্যেরা আপনাদের স্বাধীনতারক্ষার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে, তাঁহাদের পরাজয় হইল, পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত সাগরে ভারতের সৌভাগ্যরবি ডুবিয়া গেল।

এই সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আধিপত্য আরম্ভ হইল এই সময় হইতে ভারতের এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য মুসলমানের অৰ্দ্ধ-চন্দ্রশোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল। ক্রমে নূতন নূতন বংশের লোক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিলেন। ঐ নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্যের পূর্ব্বে রামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব-মত প্রচার করিয়াছিলেন, এক্ষণে উত্তর ভারতবর্ষে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে যত্নবান হইলেন, এবং মধ্যভারতবর্ষে কবীর, বেদ ও কোরাণ, উভয়েরই বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ঐশ্বরিক তত্ত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই

সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছু কাল পরে নবদ্বীপের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবক পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত-প্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেমপ্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এইসময়ে ইউরোপে মহামতি লুথর জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত ছিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর এক জন দরিদ্র ক্ষত্রিয়-যুবক ধর্ম্ম-জগতে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, যে সময়ে তাঁহার প্রতিভা-বলে পঞ্জাবে একটি নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃশদ্বতীর তটে হিন্দুদের বিজয়পতাকা ধরাশায়ী হইলে, যে নূতন জাতির লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহাদের সংস্রবে ঐ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল, বেদের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইল, এবং ধর্ম্ম-প্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। তাহাদের মোল্লা, পীর ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে হিন্দুদের দেবতা অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, এবং হিন্দুদের পরিশুদ্ধ ভক্তি, পবিত্র ঈশ্বরপ্রীতি ও জাতি-বিচার, সমস্তই পদদলিত করিয়া, কোরাণের মাহাত্ম্য-প্রচারে উদ্যত হইলেন। ক্রমে নূতন নূতন কুসংস্কার আসিয়া মুসলমান ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল, ক্রমে কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তি-জালে জড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া

লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মহম্মদ, কিছুতেই তৃপ্তি লাভ না করিয়া, নূতনের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময়ে যিনি ধর্ম্ম-বিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, রোমের ধর্ম্ম-মত যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পবিত্র ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ ঐ সময়ে আপনাদের ধর্ম্ম-মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন, ধ্যান-ধারণাদি কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না। রোমীয়গণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া অন্য কোন অভিনব উপাসনা-পদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। নানা মতের ঘাতপ্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-তত্ত্ব ক্রমে লোকের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে থাকে, শেষে প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া জুপিতরের ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয়পতাকা উড়াইয়া দেয়। ভারতবর্ষও এইরূপে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায়

চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্ম-পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া, হিন্দুগণ নূতন নূতন ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কারে অভিনিবিষ্ট হন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটি নূতন রেখাপাত করিয়া দেন। ঐ সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত নানকের প্রতিভাগুণে সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন করিয়া যান, নানক তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার ধর্ম্ম মত অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোবিন্দ সিংহ ঐ প্রশস্ত ভিত্তিস্থাপিত, প্রশস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লঘু গুরু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া ভ্রাতৃভাবে অলিঙ্গন করেন এবং সকলের শিরায় শিরায় অচিন্তনীয় উৎসাহ-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন।

শিখ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

নানকের জীবন-চরিত ও নানকের ধর্ম্মমত শিখ জাতির ইতিহাসের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। নানক শাহ অথবা বাবা নানক খ্রীঃ ১৪৬৯ অব্দে লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণ কানাকুচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালুবেদী। তিনি

ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ। নানকের বিবরণ অনেক কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। যখন যিনি পরিদৃশ্যমান জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, মানব-কল্পনা তখনই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ ঘটনার প্রচার করিতে থাকে। নানক ধর্ম্মজগতে যেরূপ ক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে, নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচারিত হইবে, তাহা বিস্ময়-জনক নহে। শিখগণ আপনাদের ধর্ম্ম-গুরুর মহিমা বাড়াই-বার জন্য যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ে কখনও বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। যাহা হউক, নানক অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে গণিত ও পারস্য ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি স্বভাবতঃ শুদ্ধাচারী ও চিন্তাশীল ছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সাংসারিক কার্য্যে ও সাংসারিক ভোগসুখে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। কালুবেদী পুত্রকে সংসার-ধর্ম্মে আনয়ন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন, নিজে ৬০টি টাকা দিয়া তাঁহাকে লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী বা সে অনুরোধ প্রতিপালিত হইল না। নানক পিতৃদত্ত মুদ্রায় খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া অনাহারী উদাসীন ফকীরদিগকে ভোজন করাইলেন।

নানক যৌবনাবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমস্ত অনুশাসন এবং বেদ ও কোরাণের সমস্ত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ইহার পর আপনার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রগাঢ় শাস্ত্র জ্ঞান-বলে উদার ও পরিশুদ্ধ মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। তিনি সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও সমস্ত কুসংস্কারময় লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে হৃদয়ের শান্তিলাভ হয়, যাহাতে পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারিত হয়, তাহাই জীবনের সারধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইল। নানক সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম-পদ্ধতিতে নানাবিধ কুসংস্কারের প্রাচুর্ভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি সন্ন্যাসিবেশে ভারতবর্ষের নানা স্থান বেড়াইলেন, অনেক সাধু ও যোগীর সহিত আলাপ করিলেন, আরবের উপকূল অতিবাহিত করিয়া ফকীরদিগের কার্য্যকলাপ দেখিলেন, কিন্তু কোথাও পবিত্র সত্যের আভাস পাইলেন না। সকল স্থানেই কুসংস্কারের ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, সকল স্থানেই কর্ম্ম-কাণ্ডের শোচনীয় বিকার দেখিয়া, ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। স্বদেশে আসিয়া, নানক সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসিবেশ পরিত্যাগ করিলেন। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতীর তটে "কীর্ত্তিপুর" নামে একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। নানক ঐ ধর্ম্মশালায় স্বীয় পরিবার ও শিষ্য সম্প্রদায়ে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীঃ ১৫৩৯ অব্দে সপ্ততিবর্ষবয়সে ঐ স্থানেই বাবা নানকের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। নানক লোদীবংশের অভ্যুদয়-সময়ে প্রাচুর্ভূত হন এবং মোগলবংশের অভ্যুদয়ের পর কলেবর ত্যাগ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার জীবিত কালের ষাটি বৎসর, পাঁচ মাস ও সাত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল।

নানকের প্রবর্ত্তিত উদার ধর্ম্ম-পদ্ধতির আলোক প্রথমে পঞ্জাবের দৃঢ়কায়, সরল-স্বভাব জাঠগণের মধ্যে সম্প্রসারিত

হয় ক্রমে মুসলমানগণও এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে। নানকের একটি বিশ্বস্ত মুসলমানশিষ্যের নাম মর্দ্দানা। এ ব্যক্তি ছায়ার ন্যায় নানকের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকগণ যেমন নিমিষে নিমিষে উদরের চিন্তায় "হা হতোঽস্মি" বলিয়া আক্ষেপ করে, মর্দ্দানাও তেমনি কথায় কথায় ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত। সংগীত-শাস্ত্রে মর্দ্দানার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সে সর্ব্বদা বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান করিত। নানক যখন মুদ্রিত-নয়নে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন, বাহ্য জগতের সহিত কোনও সংস্রব না রাখিয়া যখন ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট হইতেন, তখন মর্দ্দানা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও তদ্গতচিত্তে মধুর বীণাসংযোগে গান গাইত।

যাহাতে দেশ হইতে বাহ্য ক্রিয়া-কলাপ ও জাত্যভিমানের উন্মূলন হয়, যাহাতে লোকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সাধুবৃত্তি অবলম্বন করে, নানক তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে নানাজাতিতে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকা উচিত নহে। দেবালয়ে গিয়া যাগযজ্ঞ করা এবং তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন করানও কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্ত-সংযমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। আত্ম-শুদ্ধি নানকের মূল মন্ত্র। বিশুদ্ধ-হৃদয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। নানক কহিতেন, ঈশ্বর এক ভিন্ন বহু নহেন এবং প্রকৃত বিশ্বাস এক ভিন্ন নানাপ্রকার নহে। তবে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত মাত্র। তিনি সমভাবে মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও

সন্ন্যাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া; যে ঈশ্বর, অসংখ্য মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবকে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ও তৎপ্রতি চিত্ত স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম, দয়া, বীরত্ব ও সংগৃহীত জ্ঞান বস্তুতঃ কিছুই নহে। যে জ্ঞান-বলে ঈশ্বরের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্। সৎকার্য্যে ও সদাচারে সেই এক, প্রভুর প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদভাজন হওয়া যায়। নানকের মতে সংসার বিরাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম অনাবশ্যক। তিনি কহিতেন, সাধু যোগী ও পরমাত্মনিষ্ঠ গৃহী, উভয়েই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের চক্ষে তুল্য। ধর্ম্মানুযায়ী মতের সম্বন্ধে নানকের আরও কতকগুলি উক্তি আছে। সেই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এ স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। এক দিন ব্রাহ্মণেরা স্নান করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণমুখ হইয়া তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নানক জলে দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া জল সেচিতে লাগিলেন। সকলে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নানক কহিলেন, "তাঁহার কীর্ত্তিপুরের ক্ষেত্র পশ্চিম দিকে আছে, তিনি সেই ক্ষেত্রে জল সেচিতেছেন।" ঐ কথা শুনিয়া সকলে উপহাসপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, "কীর্ত্তিপুর বহুশত ক্রোশ দূরে আছে, এই জল কিরূপে ততদূর যাইবে?" নানক গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "তবে তোমরা ইহলোকে জল সেচিয়া পরলোক গত পূর্ব্ব পুরুষগণের তৃপ্তি জন্মাইবার আশা করিতেছ কেন?" ১৫২৬ কি ২৭ খ্রীঃ অব্দে নানক প্রথম মোগল-

সম্রাট বাবর শাহের দ্রব্যসামগ্রী বহন করিবার জন্য ধৃত হন। বাবর, নানকের আকার প্রকার, সাধুতা ও বাক্‌চাতুরীতে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন এবং তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য অনেক সম্পত্তি দিতে চাহেন। নানক ঐ দানগ্রহণে অসম্মত হইয়া কহেন, "আমার কিছুরই অভাব নাই, আমার সঞ্চয় এমন অক্ষয় যে, কখনও উহার হ্রাস হইবে না।" বাবর শাহ এই কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলে, নানক স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, তাঁহার হৃদয় কেবল পরমেশ্বরের সাধনাতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সময়ান্তরে নানক আর এক বার কহিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের নামামৃত পান করিয়া, তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা, সমুদয়েরই একবারে শান্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি কেবল সেই অমৃতেই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন। কথিত আছে, নানক মক্কায় যাইয়া একদিন কাবানামক উপাসনা-মন্দিরের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করেন। উহাতে পবিত্র মন্দিরের অবমাননাকারী বলিয়া সেখানে তাঁহার বড় নিন্দা হয়। নানক এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তত্রত্য মুসলমানদিগকে কহিয়াছিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, যে দিকে পা ফিরাই, সেই দিকেই তাঁহার অবমাননা হইতে পারে। এখন কোন্ দিকে পা রাখিয়া নিস্তার পাই, বল?" নানক অন্য সময়ে কহিয়াছিলেন, "এক লক্ষ মহম্মদ, দশ লক্ষ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং এক লক্ষ রাম, সেই সর্ব্বশক্তিমানের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মৃত্যুর শাসনাধীন, কেবল ঈশ্বরই অমর। তথাপি এই ঈশ্বরের উপাসনাতে সম্মিলিত হইয়াও লোকে পরস্পর বাদানুবাদ করিতে লজ্জিত হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কুসংস্কার এখনও সকলকে

বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহার হৃদয় সৎ, তিনিই প্রকৃত হিন্দু যাঁহার জীবন পবিত্র, তিনিই প্রকৃত মুসলমান।” নানক যেরূপ পবিত্র ও উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনাপদ্ধতি যেরূপ সকল স্থলে, সকল সময়ে অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য তিনি কখনও স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কার প্রকাশ করেন নাই। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের এক জন দাস ও বিনয়ী আদেশবাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। নিজের লিখিত ধর্ম্মানুশাসন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে পূর্ণ হইলেও তিনি কখনও উহার উল্লেখ করিয়া আত্মগরিমার বিস্তারে উন্মুখ হন নাই এবং নিজের ধর্ম্মপ্রচারে অসাধারণ ভাবের বিকাশ থাকিলেও কখনও উহা অমানুষী ঘটনায় কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি কহিতেন, “ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না। আপনাদের মতের পবিত্রতা ব্যতীত সাধু ধর্ম্মপ্রচারকগণের অন্য কোনও অবলম্বন নাই।”

গুরু নানক এইরূপে কুসংস্কার ও ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিয়া, আপনার শিষ্যদিগকে উদার ও পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে শিষ্যগণ তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্ম-পদ্ধতির উপর স্থাপিত হইয়া ধীরে ধীরে একটি নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মপরায়ণ বৃহৎ সম্প্রদায় হইয়া উঠিল। শিষ্য শব্দের অপভ্রংশে “শিখ” শব্দের উৎপত্তি হইল। কেহ কেহ বলেন যে, শিখা হইতে “শিখ” নাম হইয়াছে। যে সকল পঞ্জাবীর মস্তকে শিখা আছে, অনেকের মতে, তাহারাই “শিখ”। যাহা হউক, নানকের শিষ্যগণ অতঃপর সাধারণের নিকটে এই শিখ নামেই পরিচিত হইতে লাগিল।

শিখদিগের জাতীয় উন্নতি।

দেবর্ষি নারদ একদা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি বল প্রকাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করেন না ত?" নারদের এই উক্তিতে একটি গুরুতর রাজনৈতিক উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। দুর্ব্বল সম্প্রদায় নিপীড়িত হইলে ক্রমে আপনার বল সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং এক সময়ে পীড়ন-কারীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া তাহার ক্ষমতা নষ্ট করে। এই জন্য দেবর্ষি নারদ উপদেশ দিয়াছেন, রাজা দুর্ব্বল শত্রুকে সাতিশয় পীড়িত করিবেন না; যেহেতু দুর্ব্বল নিপীড়িত হইলে, ক্রমে সবল হইয়া এক সময়ে রাজার সহিত শত্রুতাচরণে উদ্যত হইবে। অনেক রাজা এই নারদীয় উপদেশে ঔদাসীন্য দেখাইয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছেন। ইতিহাস উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে অসমর্থ নহে। কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতে মুসলমানরাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। মুসলমান সম্রাটগণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, দক্ষিণাপথের নিরীহ কৃষাণগণ যুদ্ধবীরের পদে অধিরোহণ পূর্ব্বক প্রাতঃস্মরণীয় শিবজীর পতাকার অধীনে সজ্জিত হয়, এবং আর্য্যাবর্ত্তের শিখেরা ধীরে ধীরে শক্তি ও সাহস সংগ্রহ করিয়া উৎপীড়ন-কারী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে থাকে। শিখদিগের এই সমুত্থানের বিবরণ বৈচিত্র্য-পূর্ণ। নানকের মৃত্যুর পর অমরদাস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। এ পর্য্যন্ত শিখগণ সংযত চিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমো-

দিত কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিল। কালক্রমে মুসলমানদিগের অত্যাচারে এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহারা পশুর ন্যায় বধ্য ভূমিতে নীত হইতে লাগিলেন, অসামান্য অত্যাচার, অশ্রুতপূর্ব্ব যন্ত্রণায় সকলের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে লাগিল। শিখ গুরু বন্দু লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন। অন্যতম গুরু অর্জ্জুনমল মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের আদেশে কারাবদ্ধ হইলেন। কারাগারের অসহনীয় যাতনায় অথবা ঘাতকদিগের প্রাণান্তক অস্ত্রাঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হইল। অর্জ্জুনের পর তদীয় পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদে সমাসীন হইয়া মুসলমানদিগের একান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। এপর্য্যন্ত শিখগণ, যে নিরীহভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, অর্জ্জুনমলের মৃত্যুতে সে নিরীহভাব দূর হয়। প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদাই দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি অম্লানভাবে উত্তর দিতেন, “এক খানি পিতার অপঘাতমৃত্যুর প্রতিশোধ জন্য, অপর খানি মুসলমানদিগের শাসনের উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত হইতেছে।” হরগোবিন্দ শিখ-সমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু হরগোবিন্দের অস্ত্রের বলে শিখদিগের অভীষ্ট বিষয় সাধিত হয় নাই। এই অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধির জন্য শিখ সমাজে আর এক মহাপুরুষ অবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বশ্রেণীর—স্বজাতির অসহনীয় যন্ত্রণা দেখিয়া অধ্যবসায় ও উৎসাহসহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, সাহস ও মহাপ্রাণতা শিখ-দলে প্রবেশ

করিয়া তাহাদের মধ্যে অভিনব জীবনীশক্তির সঞ্চার করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, বেদনাবোধ প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ শিখদিগের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবধি মহাপুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, শিখগণ মহাপ্রাণ হইয়া উঠিল। এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্র-দাতার নাম গোবিন্দ সিংহ।

গোবিন্দ সিংহই প্রথমে শিখদিগকে সাম্যসূত্রে সম্বদ্ধ করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভা-বলেই হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে। গোবিন্দ সিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় জীবনের প্রথম পরিপোষক। শিখগণ যে তেজস্বিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-কুশলতায় ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ সিংহই তাহার মূল। তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতায় শিখ-গুরু-সমাজে গোবিন্দ সিংহের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ভারতবর্ষের সকলকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর কেহই যত্ন করেন নাই।

গোবিন্দ সিংহের জীবনের সহিত শিখদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে পাটনা নগরে গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম তেগবাহাদুর। তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। তরবারির অধিস্বামীকে তেগবাহাদুর বলা যায়। যাহা হউক, হরগোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাদুর নম্রভাবে

কহিয়াছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র নহেন। তেগবাহাদুর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রামরায়ের চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া দিল্লীর অধিপতির বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন। অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তেগবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে যাইবার সময়ে তেগবাহাদুর গোবিন্দ সিংহকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ পূর্ব্বক কহেন, "পুত্র! শত্রুরা আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে হত্যাকরে, তাহাহইলে আমার মৃত্যুর জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে। দেখিও, মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন শৃগালকুক্কুরে নষ্ট না করে, দেখিও, এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।"

গোবিন্দ, পিতার এই শেষ আদেশপালনে প্রতিশ্রুত হন। তেগবাহদুর পুত্রের প্রতিশ্রুতিতে প্রফুল্ল হইয়া দিল্লীতে যাত্রা করেন। কথিত আছে, তিনি দিল্লীতে উপনীত হইলে সম্রাট অবজ্ঞা ও উপহাসসহকারে তাঁহাকে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা স্বীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতে অনুরোধ করেন তেগবাহাদুর ইহাতে নির্ভয়ে গম্ভীরভাবে কহেন, "সর্ব্বশক্তি-মান্ ঈশ্বরের উপাসনা করাই মানুষের কর্ত্তব্য। তথাপি একটি বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে। আমি একখণ্ড কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া রাখিতেছি। গলদেশের যে অংশে এই লিখিত কাগজ নিবদ্ধ থাকিবে, ঘাতকের অসি যেন সে স্থান

স্পর্শ না করে।" তেগবাহাদুর ইহা কহিয়া, লিখিত কাগজ গলায় বাঁধিয়া ঘাতকের দিকে মাথা বাড়াইয়া দিলেন। নিমিষ মধ্যে উত্তোলিত অসি তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল, নিমিষ মধ্যে তেজস্বী শিখ-গুরুর দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক মৃত্তিকায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এই অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগ ও এই অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দেখিয়া দিল্লীর ধর্ম্মান্ধ সম্রাট্ বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন সেই লিখিত কাগজ খোলা হইল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আওরঙ্গজেব সবিস্ময়ে ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে——

"শির্ দিয়া আওর্ শের নেহি দিয়া।"

"মাথা দিলাম, কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব দিলাম না।"

এইরূপে ১৬৭৫ অব্দে তেগবাহাদুরের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। এইরূপে তেগবাহাদুর আপনার লোকাতীত মহাপ্রাণতা দেখাইয়া ধীরভাবে ঘাতকের হস্তে জীবন সমর্পণ করিলেন। এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ ধর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর শরীরীর এই অবিনশ্বর কীর্ত্তির কাহিনী চিরকাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে।

পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া গোবিন্দ সাতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "বন্ধুগণ! তোমরা শুনিয়াছ, আমার পিতা দিল্লীতে নিহত হইয়াছেন। আমি এখন এই সংসারে একাকী রহিলাম। কিন্তু আমি যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎ তাঁহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত থাকিব না। এই কার্য্যে আমি মৃত্যুকেও তুচ্ছ

স্নান করিব। পিতার মস্তক এখন দিল্লীতে রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কি, উহা আনিতে পারিবে না?" গুরুর এই কথায় একটি শিষ্য তেগবাহাদুরের মস্তক আনিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। গোবিন্দ তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শিষ্য দিল্লীতে যাইয়া তেগবাহাদুরের মস্তক লইয়া পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিল। এ দিকে আওরঙ্গজেবের আদেশে তেগবাহাদুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করা হইল।

যখন তেগবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গুরু গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, অত্যাচারী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধার-সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে এক ভূমিতে আনয়ন করিয়া একটি মহাসম্প্রদায়ে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বয়সের অল্পতায় তাঁহার ধীরতা বিচলিত হইল না, বুদ্ধির কোমলতায় তাঁহার দৃঢ়তা অন্তর্দ্ধান করিল না, মতির মৃদুতায় তাঁহার ভোগ-স্পৃহা বিকাশ পাইল না। তিনি পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া যমুনার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। এই স্থানে মৃগয়ায়, পারস্য ভাষা অধ্যয়নে ও স্বজাতির গৌরব-কাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভারতে মোগল-রাজত্বের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে। আকবরের উদারতা, আকবরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকের স্মৃতিতে মুহুর্মুহুঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাহজহাঁর শোচনীয়

পরিণাম দেখিয়া লোকে অশ্রুপাত করিতেছে। দুরন্ত আওরঙ্গজেব পাশব শক্তিতে ভারতভূমি শাসনে উদ্যত হইয়াছেন। পূর্ব্বদিকে পরাক্রান্ত রাজসিংহ ঐ শক্তির গতি-রোধে উদ্যত হইয়াছেন, দক্ষিণে প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী হিন্দু আর্য্যের গৌরব-রক্ষার জন্য অলৌকিক বীর-মহিমার পরিচয় দিতেছেন, আর উত্তরে একটি তরুণ যুবক ঐ শক্তির মূলে আঘাত করিবার জন্য দুর্গম গিরি-কন্দরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে গভীর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

যুবক সংযতচিত্তে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত, গম্ভীর। তাহাতে বিলাসের কালিমা নাই, সাংসারিক প্রলোভন-চিহ্নের বিকাশ নাই, আত্মস্বার্থের চাতুরী নাই। যুবক ভোগ-বিলাসের পঙ্কিল ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া, নিবাত, নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায়, অচল অপার বারিধির ন্যায় স্থিরভাবে পর-পীড়িত মাতৃভূমির হিতসাধন উদ্দেশে আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ শিক্ষার জন্য বরণীয় দেবতার আরাধনা করি-তেছেন। এ চিত্র কল্পনার তুলিকায় প্রতিফলিত হয় নাই, উপন্যাসের মোহিনী মায়ায় প্রতিবিম্বিত হয় নাই। ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক চিত্র। পাঠক! তুমি মাট্‌সিনীর কীর্ত্তির কথা পড়িয়াছ, গারিবল্‌দির উদ্দাম বীরত্বে স্তম্ভিত হইয়াছ, ওয়াশিংটনের দৃঢ়তার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছ, শেষে বক্তৃতাভূমিতে জলদ-গম্ভীর স্বরে মাট্‌সিনীর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছ, গারিবলদির গরীয়সী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছ; কিন্তু এক সময়ে তোমার মাতৃভূমিতে—এই পরাধীন পর-পদ-দলিত ঘোর দুর্দ্দশা-

ময় ক্ষেত্রে ঐরূপ আত্ম-ত্যাগ, ঐরূপ দৃঢ়তার উন্মেষ হইয়াছিল। ইতিহাসের অনুসরণ কর, বুঝিতে পারিবে।

মোগল সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হয়। আওরঙ্গজেব ছলে, বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল, আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহার অনেকগুলি নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। দক্ষিণাপথে শিবজী স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে আওরঙ্গজেবের প্রতাপ অনেকের ভীতি স্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গুরু গোবিন্দ শিখদিগের উপর নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ বোধ হয় প্রায় ২০ বৎসর যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া এই শিষ্যদল লইয়া জীবনের মহদ্‌ব্রত সাধনে উদ্যত হইলেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল। এখন একতা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তাঁহার মহামন্ত্রে শিষ্যগণ সজীব হইয়া উঠিল। গুরু গোবিন্দ এইরূপে প্রবল-পরাক্রম রাজত্বে বাস করিয়া, সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং যবন রাজগণের অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন, মানব জাতি সাধনাবলে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইচ্ছার একাগ্রতা ও হৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদনজন্য এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও বীরপুরুষদিগের কার্য্য-কলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার বুদ্ধি পৃথিবীর শিক্ষার পথ পরিস্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিয়োজিত হইত এবং তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্ব-প্রকার কুসংস্কার উন্মূলিত করিতে চেষ্টা পাইত। তিনি শিষ্য-দিগকে মহাপ্রাণ করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। দেবতাগণ কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কিরূপে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ কিরূপে আপনাদের মত প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধি-পত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং কহিতেন, "ঈশ্বর কোনও নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।"

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন, এইরূপে

তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শুনিয়া মহাপ্রাণ হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্ন পূর্ব্বক বৈদিক তত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতালাভে ঔদাসীন্য দেখান নাই। তাঁহার অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও অসাধারণ মানসিক স্থিরতা ছিল। তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বিক্রম ও অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত সংযতচিত্তে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্ম-সংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখ-সমাজে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ আপনার মহামন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য পার্থিব ভোগসুখে ঔদাসীন্য দেখাইতে লাগিলেন। অস্থায়ী ধন-সম্পত্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। আপনার বিষয়-নিস্পৃহা দেখাইবার জন্য, শিষ্যদিগকে ভোগ-বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া মহামন্ত্রসাধনে মহাবল করিবার নিমিত্ত, তিনি স্বীয় সম্পত্তি শতদ্রুতে নিক্ষেপ করিলেন। একদা এক জন শিখ সিন্ধুদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের দুই খানি সুন্দর হস্তাভরণ আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া সেই আভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। শিষ্য গুরুর এক হাত আভরণ-শূন্য দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ কহিলেন, "একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ইহা শুনিয়া,

এক জন ডুবরী আনিয়া তাহাকে কহিল, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ডুবরী সম্মত হইল। শিষ্য কোন্ স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া দিবার জন্য, গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "ঐ খানে পড়িয়া গিয়াছে।" শিষ্য ভোগসুখ বিষয়ে গুরুর এইরূপ অসাধারণ বিতৃষ্ণা দেখিয়া বিস্মিত হইল, শেষে আপনিও সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনের মহদ্‌ব্রত সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

গোবিন্দ এইরূপে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে, কোন রূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্, পরম পিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরলহৃদয়ে ও একান্তমনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে। সকলেই একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুল-মর্য্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে, এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে। ইহা তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা কহিয়া স্বহস্তে এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন ক্ষত্রিয় ও তিন জন

শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগকে "খাল্সা" অর্থাৎ পবিত্র ও বিমুক্ত বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং যুদ্ধ-কার্য্য ও বীরত্বের পরিচয় সূচক "সিংহ" উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ নিজেও এই উপাধি ধারণ করিয়া গোবিন্দ সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সমভূমিতে আনিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কার্য্য-কুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদিগুরু নানক ও তাঁহার উত্তরাধিকারি-বর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইতে লাগিল, রাজপুত-দিগের ন্যায় "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত হইয়া, দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃত যোদ্ধার পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল, "ওয়া গুরুজি কা খাল্সা; ওয়া গুরুজি কি ফতে!" (গুরু কৃতকার্য্য হউন, জয়শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণবাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরু-মঠ নামে একটি শাসন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে ঐ সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সমুদয় কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখ শাসন অস্তঃশত্রু ও

বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে শিখগণ যাহাতে একপ্রাণতা, সমবেদনা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদয় লক্ষণ-বিশিষ্ট হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া শিখ-সমাজে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্র সমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা অসিদ্ধ রহিল। তিনি পরাক্রান্ত মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খাল্সাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্য ধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ সিংহ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃহন্তা অত্যাচারী যবনদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগল-শাসন সর্ব্বাংশে বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের শাহের পরাক্রমে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোল বৎসর অতিবাহিত করেন। আকবর যদিও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতার বলে প্রায় পঞ্চাশ

বৎসর ভারতবর্ষে আধিপত্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। জাহাঁগীর ক্রুর ও ইন্দ্রিয়পর ছিলেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে কাতর হন নাই। এক সময়ে তাঁহাকে তদীয় কর্ম্মচারী মহব্বৎ খাঁর বন্দিত্বও স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শাহজহাঁ আপনার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া পুত্রদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখেন, পরিশেষে তাহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে নিরুদ্ধ হন। আওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি আপনার সন্দিগ্ধতা ও কঠোর ব্যবহারে অনেক শত্রু সংগ্রহ করেন। এক দিকে রাজসিংহ ও দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, অপর দিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে তেজস্বিতার সঞ্চার করেন। এক্ষণে গোবিন্দ সিংহ পুনর্ব্বার ঐ তেজের উৎপত্তি করিয়া, জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় কৃতকার্য্য হইবার জন্য আপনার শিষ্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া এক এক দল শিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যদিগের উপর এই সৈন্যদলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান সৈন্য আনিয়া, আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে তিনটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল

পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক যুদ্ধ করা সুবিধাজনক ভাবিয়া, তিনি ঐ সকল দুর্গ সুব্যবস্থিত করিলেন, পরে উক্ত প্রদেশের সর্দ্দারদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইলেন। এইরূপে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানা স্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধ-বীর সৈন্যাধ্যক্ষের পদে সমাসীন হইয়া সেনা নিবাস নিরাপদ করিতে ও দুর্গসমূহের শৃঙ্খলা বিধানে যত্নপর হইলেন।

মোগলদিগের সহিত প্রথম কয়েক যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হইল। কিন্তু শেষ যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ পরাজিত হইলেন। তাঁহার দুইটি শিশুপুত্র শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া নির্দ্দয়রূপে হত হইল। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইয়া মোগলদিগের মধ্যে শিখদিগের প্রাধান্য স্থাপন করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব এই তেজস্বী শিখ গুরুর তেজস্বিতায় বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে আপনার নিকটে আসিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ প্রথমে ঐ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, প্রত্যুত ঘৃণাসহকারে কহিয়াছিলেন, তিনি সম্রাটের উপর কোন রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এখনও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্ম-সংস্কার, অর্জ্জুন ও তেগবাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এখন কোন রূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ

নই, স্থিরচিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার ভীতিস্থল নহেন।” এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক প্রাপ্তি হয়। আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ গোবিন্দ সিংহের প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া জগতের সমক্ষে আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আইসে। গোবিন্দ সিংহ যখন দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার একজন পাঠান শত্রু গোপনে তদীয় শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দের মৃত্যু হয়। ১৭০৮ অব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। এই সময় গোবিন্দ সিংহের বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ শিখ-সমাজের জীবন-দাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ মহাসত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একপ্রাণতা ও স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ. তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ ও তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতা/সূত্রে আবদ্ধ ও একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে

প্রয়াস পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে, নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা তাঁহার দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ ও শূদ্রকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করেন, এবং এই জন্যই তিনি গর্ব্ব সহকারে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে লিখেন, "তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্তু সাবধান, আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখ-গুরুর এই তেজোগর্ভ বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থই শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

গোবিন্দ সিংহ তরুণ বয়সে নিহত হন। তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয়, প্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত। গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্র সাধনে উদ্যত না হইলে, শিখদিগের নাম বোধ হয়, ইতিহাস হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইত। গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়সে ও অল্প সময়ের মধ্যে শিখ-সমাজে যে জীবনী শক্তি ও যে তেজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই বলে নির্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে, নওশেরা, রামনগর ও চিলিয়ানবালার নাম, আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসে বিরাজ করিতেছে।

গোবিন্দ সিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তির বিলয় হয় নাই। যখন জনকোলাহল-পূর্ণ সুশোভন নগরী বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শত্রুর দুরধিগম্য রাজ-প্রাসাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদীন-পরাক্রম বৈদেশিকের বিজয় পতাকায় শোভিত রহিবে, যখন তরঙ্গা-বর্ত্তময়ী বিশাল তরঙ্গিণী স্বল্পতোয় গোষ্পদের আকার ধারণ করিবে, অথবা স্বল্পতোয় গোষ্পদ ভীষণ-মূর্ত্তি তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়া ভৈরব রবে জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের মহাপ্রাণতা, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও উদারতা পৃথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিবে, তখনও গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

শিখদিগের স্বাধীনতা।

খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। সম্রাটের পর সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন, শাসনকর্ত্তার পর শাসন-কর্ত্তা সম্রাটের আদেশে অবজ্ঞা দেখাইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্রিয় নিকেতন—বিচিত্র দেওয়ানিখাস সভাগৃহের লীলাভূমি সুশোভন দিল্লী মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হয়। ইহার পর দোরর়ানী ভূপতি অহম্মদ শাহ আপনার সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হন। ইহার পরাক্রমে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মহারাষ্ট্রীয়দের ক্ষমতা পর্যদস্ত হয়। দিল্লীর সম্রাট

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীন ভাবে বিহার প্রদেশে আসিয়া উপনীত হন। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে—বিলুণ্ঠন, বিপ্লাবন ও বিধ্বংসের ভয়াবহ রাজ্যে শিখগণ আপনাদের তেজস্বিতা অক্ষত রাখিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার আবির্ভাব হইতেছিল। তাহারা এই সাহসী সেনাপতি সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার অধীনে সজ্জিত হইয়া আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্র-চালনায় তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসাদিগের মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্য থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অশ্বারোহণে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। ক্রমে খালসারা অনেক দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলের এক এক জন সর্দ্দার এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমস্ত শিখ-জনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ব্বাংশে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। খালসারা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও পবিত্র ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তাহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্ছেদ্য জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতি বৎসর অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া আপনাদের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন ইঙ্গ্রেজ বণিকেরা দক্ষিণ-

পথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতে-ছিলেন, এক জন বর্ষীয়ান্ মুসলমান সৈনিক পুরুষ মহী-শূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া, যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিলেন, তখন শিখদিগের খণ্ড-রাজ্যে এক জন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল ব্যক্তির আবি-র্ভাব হয়। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে শিখেরা আবার মহা-বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। ইঁহার নাম রণজিৎ সিংহ। সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২ রা নবেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার ঐ সাহস ও রণ পাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়, এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে "কাণা রণজিৎ" নামে প্রসিদ্ধ হন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হন। রণজিৎ খর্ব্বকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি এই বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোর্‌রাণী ভূপ-তির আধিপত্য ছিল। ইঙ্গ্‌রেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া আপনাদের অধিকার প্রসারিত করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার বল সংগ্রহ করিয়া ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতা-স্পর্দ্ধী হইয়া

উঠিতেছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইঁহাদের মধ্যে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি অহম্মদ শাহ দোরৃরাণীর পৌত্র জেমান শাহের বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত হয়। ক্রমে সমস্ত মণ্ডল তাঁহার আয়ত্ত হইয়া উঠে।

পাঠানেরা যেরূপে ভারতবর্ষে সমাগত হয়, হিন্দুরাজগণের মধ্যে অনৈক্য দেখিয়া যেরূপ চাতুরী অবলম্বন পূর্ব্বক দেববাঞ্ছনীয় পবিত্র ভূমি হস্তগত করে, তাহা ইতিহাস-প্রিয় পাঠকের অবিদিত নাই। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই পাঠানদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যাহারা শঠতার বলে ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে ভারতের খণ্ড রাজ্য সকল উদ্ধার করিতে তিনি যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস অনেকাংশে সফল হইয়াছিল। তিনি প্রথমে আফগানদিগকে দূর করিয়া মুলতান অধিকার করেন, পরে ভারতের নন্দন কানন কাশ্মীরে জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। কাশ্মীর অধিকারসময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গ সিংহ সৈন্যদলের অগ্রভাগে ছিলেন। রণজিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতিক সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পদব্রজে দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। শিখদিগের বিক্রমে আফগান-সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহু দিনের পর হিন্দু নরপতির পবিত্র বিজয়-পতাকায় কাশ্মীর আবার শোভিত হইয়া উঠে। ইহার পর রণজিৎ সিংহ

পেশাবর অধিকার করিতে উদ্যত হন। ১৮১৩ অব্দের ২৩এ মার্চ্চ ভারতের একটি প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র দিন। যাহারা দৃশদ্বতীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে আপনাদের আধিপত্যের সূত্রপাত করে, শিখেরা এই দিনে তাহাদের দেশে আপনাদের জয় পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নৃপতি এই পবিত্র দিনে এই শেষ বার, সিন্ধু নদের অপর পারে হিন্দু-বিজয়ী পাঠানের শোণিত-জলে, পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের আত্মার পরিতর্পণ করিতে উপস্থিত হন। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের গভীর ভাবে আজ কে উৎফুল্ল হইবে? এ মহাশ্মশানে কে এই মহাবীরের মহাকীর্ত্তির কাহিনীতে কর্ণপাত করিবে? মহারাজ রণজিৎ সিংহ অকুতোভয়ে বিপুল সাহসে পাঠানের রাজ্যে উপনীত হইলেন। আফগানিস্থানের প্রধান সর্দ্দার আজিম খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য একত্র করিয়াছিলেন, বহুসংখ্য সৈন্য আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। ১৪ই মার্চ্চ কাবুল নদীর পার্শ্ববর্ত্তী নওশেরা নামক স্থানে ইহাদের সহিত রণজিৎ সিংহের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দিকে দীর্ঘকায় ভীমমূর্ত্তি আফগান জাতি, অপর দিকে সাহসী যুদ্ধকুশল শিখ সৈন্য। এই মহাসমরে মহাবীর রণজিৎ সিংহ অশ্বারোহীদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিশাল দেহ আফগানগণ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া অপ্রতিহত বিক্রমে এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সমস্ত দিন শিখেরা অতুল বিক্রমের সহিত আফগানদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল, ক্রমে গভীর অন্ধকার

গভীরতর হইয়া রণস্থল ঢাকিয়া ফেলিল। শোণিত-নদী এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথাপি রণজিৎ সিংহ যুদ্ধে বিরত হইলেন না, পূর্ব্বের ন্যায় লোকাতীত বিক্রমে যবনসৈন্যে নির্ম্মূল করিতে লাগিলেন। শেষে আফগানেরা পঞ্জাব-কেশরীর পরাক্রম সহিতে পারিল না, তাহারা অন্ধকারে আবৃত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। বহু যুগের পর হিন্দু ভূপতির বিজয়-পতাকা পাঠান ভূমির মধ্যভাগে উড্ডীন হইয়া নৈশ সমীরণে দুলিতে দুলিতে বিপক্ষদিগকে তর্জ্জনা করিতে লাগিল। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বীরপুরুষ এইরূপ লোকাতীত পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, এইরূপে পাঠানগণ উনবিংশ শতাব্দীতে শিখদিগের লোকাতীত পবাক্রমের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে এইরূপ দুর্জ্জেয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, আর তাঁহার যুদ্ধ-কুশল সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালীঅনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তিনি মহাবল-পরাক্রান্ত হইলেও ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ-করিয়া পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই।

রণজিতের জীবনী-লেখক বলিয়াছেন, 'রণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মতই ইহলোক পরিত্যাগ

করিয়াছেন।’ এই সিংহবিক্রম মহাবীরের সমস্ত কথা এ স্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করা সম্ভব নহে। যাঁহারা যথানিয়মে শিক্ষা পাইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষের তুলনা করাও উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্যের প্রদত্ত শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই। এগুলি আপনা হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল। রণজিৎসিংহ আপনার স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জগতে মহৎ লোকের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। আপনার সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও রণপারদর্শী করা, তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ফরিদ খাঁ শূর একাকী ব্যাঘ্র বধ করিয়া শের শাহ নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অস্তাজিলো নামক একজন বীরপুরুষ এক সময়ে ঐরূপ সাহস দেখাইয়া শের আফগান নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুল লাবণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই দুই বীরের সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ সৈন্য মৃগয়ার সময়ে একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে। তাহারা অশ্বারোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে ও শত্রুপক্ষের ব্যূহভেদে পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধ-বীরের তুল্য যোগ্যতা দেখাইয়াছে।

বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ বীর-লীলাস্থল ভারতে যথার্থ বীর

পুরুষ। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় বীর পুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ যখন তিরৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠানদিগকে পরাজিত ও দুরীভূত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃশদ্বতীর তটে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরত্বে শত্রুর হৃদয়েও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, অদীনপরাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভারতের থর্ম্মাপলী, পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ—হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিততরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াও ধীর-গম্ভীর-স্বরে কহিয়াছিছিলেন, "এই ভাবে দেহ বিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে," তখন তাঁহার লোকাতীত মহাপ্রাণতা ও স্বদেশের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্ম্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসা-গীতি গাইয়াছিল, আবার মহাবিক্রম শিবজী যখন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে যাইয়া, বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌ও তাঁহার অপূর্ব্ব দেশভক্তি ও অপূর্ব্ব বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীর পুরুষগণের অনন্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল, উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক সময়ে এই বীর পুরুষগণের অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ব-বৈভব শিবজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্য্য-বহ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গে ভারতের যবন-রাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই মহাশক্তির ভক্ত শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া যায়

নাই। শিবজীর পর গুরুগোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া, রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে ঐ মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আবার চারি দিকে বীরত্ব মহিমা প্রসারিত করিয়া ভৈরব রবে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

শিখ-রাজ্যের অধঃপতন।

পঞ্জাব-কেশরীর পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিখদিগের জাতীয় স্বাধীনতার অধোগতির সূত্রপাত হয়। গুরুগোবিন্দের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও রণজিৎ সিংহের শাসনে পরিচালিত এই মহাজাতির শোচনীয় পরিণামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর লাহোর-দরবার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। রাজ্য মধ্যে নরহত্যা সঙ্ঘটিত ও নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এক জনের পর আর এক জন, লাহোরের গদিতে অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন। অবশেষে রণজিৎ-মহিষী মহারাণী ঝিন্দন আপনার শিশু পুত্র দলীপ সিংহের নামে রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হন। এই সময় শিখদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ সেনানায়কদিগের অসীম চাতুরীর প্রভাবে ও আপনাদের সেনাপতিগণের অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্বাস-ঘাতকতায় শিখেরা পরাজয় স্বীকার করে। আজ পর্য্যন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। কোন কোন সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বিদেশীর হস্তে পড়িয়া ভারতের ইতিহাস অনেক স্থলে কলঙ্কিত ও অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও দুই এক জন অপক্ষপাত লেখকের সত্য-

নিষ্ঠায় উদারতার সম্মান রক্ষিত হইয়াছে। যদি এইরূপ অপক্ষপাত ও উদার-স্বভাব ঐতিহাসিক ভারতের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি অসঙ্কুচিত-চিত্তে নির্দ্দেশ করিবেন যে, স্বজাতি-দ্রোহী রাজা লাল সিংহ ও সর্দ্দার তেজ সিংহ গোপনে কাপ্তেন নিকলসন্ ও কাপ্তেন লরেন্সের সহিত ষড়যন্ত্র না করিলে প্রথম শিখ-যুদ্ধে রণজিতের সুশিক্ষিত খাল্‌সা সৈন্য ব্রিটিশ সেনার নিকট মস্তক অবনত করিত না *। ঐ যুদ্ধের পর ভারতের গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হার্ডিঞ্জ্ লাহোর দরবারের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মহারাজ দলীপ সিংহ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক হন। দলীপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত শাসনসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য লাহোর-দরবারের কতিপয় সুদক্ষ লোক লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হয়। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ঐ শাসন-সংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ হন। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার সাক্ষাৎসম্বন্ধে লাহোর দরবারের শীর্ষদেশে থাকিয়া সমগ্র পঞ্জাবে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন।

* যখন শিখ-সৈন্য ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লাল সিংহ তত্রত্য এজেণ্ট কাপ্তেন নিকল্‌সনের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঙ্‌-রেজপক্ষের উৎকোচে এইরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়া লালসিংহ ফিরোজসহরের যুদ্ধে প্রথমেই পলায়ন করেন। এই সময়ে সর্দ্দার তেজসিংহ ২০ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেও অল্পসংখ্যক পরিশ্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্য আক্রমণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত লালসিংহ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হই-লেও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরস্ত হন। অধিকন্তু তিনি ১৮৪৬ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কাপ্তেন লরেন্সের নিকট সোব্‌রাঁও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্বীয় সৈন্য-নিবেশের বিবরণ পাঠাইয়া দেন।

এই সন্ধির পর অদম্য ব্রিটিশ সিংহ ক্রমেই পঞ্জাবে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সপ্ত সিন্ধুর প্রসন্ন-সলিল বিধৌত রণজিৎ-রাজ্যের সহিত তাঁহার ভোগ-লালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। দলীপজননী ঝিন্দন সাতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পর জাতি "সাত সমুদ্র তের নদীর" পার হইতে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্রই ব্রিটিশ কোম্পানির মুল্লুক হইবে, দেখিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, ইহার মধ্যেই পঞ্জাবের সমুদয় রাজকীয় কার্য্য আপনাদের আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, অধিক কি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে ক্রীড়া-পত্তলস্বরূপ করিতেও ক্রটি করেন নাই। বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা—এই অনধিকার-প্রিয়তায় ঝিন্দন দুঃখিত হইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ রেসেডেণ্ট হেন্‌রি লরেন্স এই তেজস্বিনী নারীকে লাহোর হইতে শেখপুর নামক নির্জ্জন স্থানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইঙ্‌রেজ ইতিহাস-লেখকগণ কহিয়াছেন, ঝিন্দন গোপনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তাঁহার ঐ রূপ দণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু যথানিয়মে এই আরোপিত অপরাধের বিচার করা হয় নাই। রেসিডেণ্ট বিনাবিচারে, কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, দলীপ সিংহের মাতাকে শেখপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষে মহারাণী ঝিন্দন এই শেখপুরেও দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী রেসিডেণ্ট স্যার ফ্রেড্‌রিক্

কারি তাঁহাকে একবারে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহ রেসিডেণ্টের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন, সুতরাং স্যার ফ্রেড্‌রিক্ কারির অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। অবিলম্বে ঝিন্দনের নিষ্কাশন-লিপি দলীপসিংহের নামযুক্ত মোহরে শোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্ম্মচারী দুই জন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের সহিত ঐ লিপি লইয়া শেখপুরে ঝিন্দনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহারাণী ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত নির্ব্বাসন-দণ্ড-লিপির নিকট মস্তক অবনত করিলেন, অটলভাবে স্বীয় দুরদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিয়া, চিরজীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যে পঞ্চনদ তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এত দিনের পর সেই পঞ্চনদ তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। প্রথমে তাঁহাকে ফিরোজপুরে আনিয়া পরিশেষে বারাণসীতে উপস্থিত করা হয়। মহারাণী ঝিন্দন, হিন্দুর আরাধ্য ক্ষেত্র—হিন্দুত্বের নিদর্শন-ভূমি কাশীধামে উপনীত হইয়া মেজর জর্জ ম্যাক্‌গ্রেগর নামক এক জন সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হন।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন-ব্যাপার সম্পন্ন হইল। পঞ্জাব ধীর জলধির ন্যায় নিশ্চলভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিল। একটি মাত্রও বারি-বিন্দু তাহার নেত্র হইতে বিগলিত হইল না, যে বহ্নি তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, এ সময়ে তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন

করিল না। পঞ্জাব যোগ-নিদ্রাভিভূত বিরাট্ পুরুষের ন্যায় জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণবিশিষ্ট নহে, এই নির্জ্জীবত্ব প্রকৃতি নির্জ্জীবত্বের পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা। দলীপসিংহ সুখময় বাল্য-লীলা-তরঙ্গে দোলায়মান হইতে ছিলেন, জননীর শোচনীয় পরিণামে তিনি কাতর হইলেন না। ভবিষ্য-জীবন—ভবিষ্য-সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বালক রেসিডেণ্টের মন্ত্রে মোহিত হইয়া অম্লান বদনে, অতল অনন্ত সাগরে স্নেহময়ী জননীর বিসর্জ্জন দেখিল। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘকাল নিস্তেজ অবস্থায় থাকে নাই, যে অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্য ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিতে অবিলম্বে ঐ জড়ত্ব সজীবতায় ও ঐ নিগূঢ় তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের কিছুকাল পরেই সমস্ত পঞ্জাব অদৃষ্টচর তেজস্বিতার বলে, অপূর্ব্ব জাতীয় জীবনের মহিমার প্রসাদে ঐ সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ভীষণ অগ্নি-কাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন ব্যতীত আরও দুইটি কারণে শিখেরা ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ঐ কারণদ্বয়ের একটি দলীপসিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অসম্মতি, অপরটি বৃদ্ধ শিখ-সর্দ্দার ছত্র সিংহের অপমান। সর্দ্দার ছত্র সিংহ হাজরার শাসনকর্ত্তা

ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ বলিয়া, শিখসমাজে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র সেনাপতি শের সিংহও উদারপ্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন। মহারাজ দলীপসিংহের সহিত সর্দার ছত্র সিংহের দুহিতা অথবা শের সিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্ নামক এক জন সহৃদয় সৈনিক পুরুষ উপস্থিত বিবাহের সম্বন্ধে লাহোরের রেসিডেণ্টকে লিখেন, "এখন সকলেই প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলযোগ ও সৈন্যগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন। এই সময়ে যদি মহারাজকে একটি মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্ধিরক্ষা করিতে বিটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্ন আছে বলিয়া, সাধারণের মনে স্থির বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ লোকের মন আশ্বস্ত হইবে।" স্যার্ ফ্রেড্‌রিক্ কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারে সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন, স্বীকার করিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহারাজ, তাঁহার বিবাহ-পাত্রী ও তৎপরিবার-বর্গের সম্মান ও সুখ বৃদ্ধি করিতে বিলক্ষণ উৎসুক আছেন। কিন্তু তিনি যে কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না। কূটমন্ত্রণাপর রেসিডেণ্ট অবশেষে লিখিলেন, "দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, পঞ্জাবে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতির রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যাপক্ষ ও দরবারের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে,

এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই।" যাঁহারা সরল-প্রকৃতি, যাঁহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা আপনাদের ন্যায় রেসিডেণ্টের ঐ লিখন-ভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির রহস্যভেদে সমর্থ, যাঁহাদের মস্তিষ্কের সজীবতায় মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সংসার বিরাগী উদাসীন-বেশে বনে বনে বেড়াইতেছেন, পক্ষান্তরে সংসার-বিরাগী উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর পদে সমাসীন হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড চালনা করিতেছেন, তাঁহারা অনায়াসেই ঐ লিপিতে বুঝিতে পারিবেন যে, রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া তেজস্বী শের সিংহকে দলীপ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিতে সম্মত নহেন, বুঝিতে পারিবেন, দলীপ সিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর-দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখ-হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবী। আজ যাহা রণজিৎ-রাজ্য বলিয়া সাধারণের নিকটে পরিচিত হইতেছে, কাল তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্রিটিশ ভাব, ব্রিটিশ আচার ও ব্রিটিশ নীতির ক্রীড়া-ক্ষেত্র হইবে।

এ দিকে রেসিডেণ্টের আদেশে সর্দ্দার ছত্র সিংহের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হইল। বৃদ্ধ সর্দ্দার অপমান ও দুরবস্থার একশেষ ভুগিতে লাগিলেন। স্বদেশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনে, বৃদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে শিখ সেনাপতি মহাবীর শের সিংহের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া আপনাদের

স্বাধীনতা অক্ষত রাখিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিলেন। এইরূপে ইঙ্গ্‌রেজদিগের সহিত শেরসিংহের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথম রামনগরের যুদ্ধে ইঙ্গ্‌রেজ সৈন্য পরাজিতপ্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিল। ইহার পর শের সিংহ চিলিয়ানবালায় যাইয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। ১৮৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি ভারতের একটি চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনে শিখেরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য চিলিয়ানবালার ক্ষেত্রে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বিজয়শ্রীর অধিকারী হয়, এই দিনে মহাবীর শের সিংহের পরাক্রমে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গফ্ পরাজিত হন, এই দিনে ব্রিটিশ পতাকা শিখদিগের হস্তগত, ব্রিটিশ কামান শিখদিগের অধিকৃত, ব্রিটিশ অশ্বারোহী শিখদিগের বিক্রমে পলায়িত ও ব্রিটিশ পদাতিক শিখদিগকর্ত্তৃক পরাভূত হয়। সেনাপতি শের সিংহ এই দিনে বীরত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া তোপ-ধ্বনিতে চারি দিক কম্পিত করেন; যাঁহারা অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে হতসর্ব্বস্ব ও হতগৌরব করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দিনে আর্য্য-তেজ, আর্য্যসাহস ও আর্য্য-বীরত্বের নিকট মস্তক অবনত করেন। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এইরূপ লোকাতীত বীরত্বের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণ-তরঙ্গান্বিত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় গ্রীক সেনাপতিদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাহাকে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতবর্ষের থর্ম্মাপলী, আর এই চিলিয়ানবালা ভারতবর্ষের মারাথন্। মিবারের প্রতাপ সিংহ ভারতের

লিওনিদস্, আর পঞ্চনদের এই শের সিংহ ভারতের মিলতাই-দিস। যদি কোন মহাবীর বীরেন্দ্র-সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ অসাধারণ দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরাদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই লিওনিদস্ ও মিলতাইদিস, আর এই প্রতাপ সিংহ ও শের সিংহ। চিলিয়ানবালা উনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। পবিত্র ইতিহাস হইতে এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবকাহিনী কখনও অপসারিত হইবে না *।

চিলিয়ানবালার পর গুজরাটের যুদ্ধে শের সিংহের পরাজয় হয়। শিখ-সর্দ্দারেরা পরাজিত হইলেও হৃদয়ের তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিখগুরু ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার্ ওয়াল্টর্ গিলবার্টের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে গম্ভীরস্বরে কহেন, "ইঙ্গ্‌রেজদিগের অত্যাচারপ্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আমরা স্বদেশের জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। এখন আমাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীর-

* এই শেষ যুদ্ধ "দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু লাহোর দরবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না। প্রথম শিখযুদ্ধ যেমন লাহোর দরবার ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ঘটিয়াছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধ তেমন ঘটে নাই। লাহোর দরবারের অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে ইঙ্গ্‌রেজ পক্ষে ছিল। স্বদেশবৎসল সর্দ্দার শের সিংহ নানা কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ততটা সঙ্গত বোধ হয় না।

শয্যায় শয়ন করিয়াছে আমাদের কামান আমাদের অস্ত্র, সমস্তই হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি। আমরা যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে কালও তাহা করিব।” এইরূপ তেজস্বিতার সহিত শিখ-সর্দ্দারগণ একে একে আপনাদের অস্ত্র ভূমিতে রাখিলেন। পরে সকলেই গম্ভীর স্বরে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, “আজ হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের যথার্থ মৃত্যু হইল।” কিন্তু এই তেজস্বিতা—এই স্বদেশ-বৎসলতার সম্মান রক্ষিত হইল না। যে সকল শিখ গুজরাটের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-স্রোতে বীরত্বের সম্মান বীরত্বের আদর, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

যুদ্ধের পর লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ইলিয়ট সাহেবকে প্রতিনিধি স্বরূপ লাহোর-দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। স্যার ফ্রেডরিক্ কারির কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স্ পুনর্ব্বার রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ২৮এ মার্চ্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর দিন (২৯এ মার্চ্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বার পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অবিচার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া

শিখ-রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডালহৌসীর ঘোষণা-পত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিতের দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহারাজ রণজিৎসিংহের বাক্য সফল হইল। পঞ্জাব ডালহৌসীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাজনীতির গুণে ভারতের মানচিত্রে লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল *। মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব হইতে অপসারিত হইলেন। ফতেগড় তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার যে সমস্ত খাসসম্পত্তি ছিল, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাও অধিকার করিতে নিরস্ত থাকিলেন না†। যে লোকপ্রসিদ্ধ কহিনুর হীরক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ

* একদা মহারাজ রণজিৎসিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে ইঙ্গরেজীতে ব্যুৎপন্ন একজন শিখকে মানচিত্র-স্থিত লাল রঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ঐ ব্যক্তি কহিলেন, যে সকল স্থান ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত, তৎসমুদয় লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে। রণজিৎ সিংহ অমনি কহিয়া উঠিলেন, "সব লাল হো জায়েগা" অর্থাৎ কালে সমুদয়ই ইঙ্গরেজদিগের অধিকার হইয়া যাইবে।

† দলীপ সিংহ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার খাসসম্পত্তির একটি হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় হইত। লবণের খনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত শাল, অলঙ্কার প্রভৃতি জব্বাভাত ছিল। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির অছি স্বরূপ ছিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিতচিত্তে উহা বিক্রয় করেন। সিপাহিযুদ্ধের সময়ে দলীপ সিংহের ফতে গড়ের আবাসবাটীতে অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দলীপ সিংহ তাহা গ্রহণ করেন নাই।

হইতে বিপ্লবের পর বিপ্লবে মহারাজ রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ সিংহ যাহা যত্নের সহিত বাহুতে ধারণ করিতেন, ডালহৌসী "পাঁচ জুতি" * মূল্য দিয়া তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন।

পঞ্জাবগ্রহণের অঙ্গীকারপত্রে দলীপ সিংহ ও তাঁহার পোষ্য-বর্গের জন্য বার্ষিক বৃত্তি অন্যূন ৪লক্ষ ও অনধিক ৫লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যচ্যুতির পরে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাইতেছিলেন। সাত বৎসর পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৫৮ অব্দ হইতে দলীপ সিংহকে বার্ষিক আড়াইলক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়†। নানাকারণে ঐ টাকা হইতে আবার

* কহিনুরের ইতিবৃত্ত বড় অদ্ভুত। কিংবদন্তী অনুসারে ঐ মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা উজ্জয়িনীরাজের শিরোভূষণ হয়। খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালব দেশ অধিকার করিয়া উহা লাভ করেন। পাঠান-রাজত্বের ধ্বংস হইলে ঐ মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর, নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ সময়ে উহা গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহম্মদ শাহ উহা প্রাপ্ত হন। ক্রমে ঐ মণি শাহসুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহসুজাকে পরাজিত করিয়া উহা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি কহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে রণজিৎসিংহ হাসিয়া কহিয়াছিলেন, "এস্‌কো কিমৎ পাঁচ জুতি" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছে।

† এই আড়াই [illegible] দলীপসিংহের আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণ জন্য, গবর্ণমেণ্ট [illegible] ৮০ হাজার টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত

প্রতিবৎসর ৭০ হাজার টাকারও অধিক কাটান যায়। সুতরাং মহারাজ পঞ্জাবকেশরীর পুত্র এখন ইঙ্গরেজগবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ১লক্ষ ৮০ হাজার টাকারও কম পাইতেছেন।

যদি ন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ প্রতীত হইবে যে, লর্ড ডালহৌসী চিরন্তন সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব-রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। মহাবীর শের সিংহ পিতার অপমান জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, লাহোর দরবারের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। প্রতিনিধি শাসন-সমিতিতে যে আট জন সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় জন সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। অবশিষ্ট দুই জনের মধ্যে এক জনের প্রতি সন্দেহ হয়। কেবল এক মাত্র শের সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহাও স্বীয় জনকের ঘোরতর অপমান দেখিয়া। অধিকন্তু শাসন-সমিতির যে ছয় জন সদস্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, যদি তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত না হন, এবং দলীপ সিংহের রাজ্য-চ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকারের নিয়ম-পত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এইরূপে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বদেশের স্বাধীনতার হানিকারক অপবিত্র অঙ্গিকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ সকল আত্মীয়স্বজনের অনেকের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় এখন ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা প্রতিবৎসর দিতেছেন। অবশিষ্ট টাকা দিলীপ সিংহের হস্তগত না হইয়া, গবর্ণমেণ্টের কোষাগারেই যাইতেছে।

করান হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লাহোর-দরবারের শিরঃস্থানীয়, দলীপ সিংহ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক, মহারাণী ঝিন্দন বারাণসীতে নির্ব্বাসিত। স্থতরাং পঞ্জাবের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা। তথাপি কোন্ দোষে দলীপ সিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট করা হইল? কোন্ দোষে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইল? বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে দিগ্‌বিজয়ী সেকন্দর শাহ যখন পঞ্জাবে আসিয়া মহারাজ পুরুকে সমরে পরাজিত করেন, তখন তিনি পরাজিত শত্রুর অসাধারণ বিক্রম ও অসাধারণ সাহস দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্বপদে স্থাপিত ও তাঁহার সহিত মিত্রতা বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যদেশবাসী এক জন সুশিক্ষিত রাজপুরুষ সেই পঞ্জাবের আপনাদের রক্ষাধীন একটী নির্দ্দোষ নিরীহ-স্বভাব বালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সময়ের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি বিচিত্র উন্নতি!

রাজ্য-চ্যুতির সময়ে দলীপ সিংহের বয়স এগার বৎসর ছিল। তিনি এই সময়ে স্যার জন্ লজিন্ নামক একজন ইঙ্গরেজের শিক্ষাধীন হন। ১৮৫৩ অব্দে ফতেগড়ের একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক স্বীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার এক বৎসর পরে পঞ্জাবকেশরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুত্র ইঙ্গ্‌লণ্ডে উপনীত হন।* আর মহারাণী

* ইঙ্গ্‌লণ্ডে স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করা, প্রথমে দলীপ সিংহের অভিপ্রেত ছিলনা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় তিনি ঐরূপ বাস করিতে বাধ্য হইয়া-

ঝিন্দন? যাঁহার নির্ব্বাসনে প্রভুভক্ত খালসা-সৈন্য উন্মত্ত হইয়া ভীষণ অনল-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তিনি স্বীয় অবস্থার বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পরে বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া ইঙ্গ্লণ্ডে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধি-বেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে, প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্য-ভ্রষ্ট শ্রী-ভ্রষ্ট মহিষীর জীবন-স্রোত অনন্ত কাল সাগরে মিশিয়া গেল।

এই রূপে শিখ-রাজ্যের অবস্থান্তর ঘটিল। আদি গুরু নানক আপনার লোকাতীত সরলতা ও নিষ্ঠার গুণে যে স্থানে

ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহিযুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্বদেশে আসিতে দেন নাই। বহুকাল ইঙ্গ্লণ্ডে থাকিয়া দলীপসিংহ এখন স্বদেশবাসে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছানুসারে স্বদেশের কোন স্থানে যাইতে পারিবেন না, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দীস্বরূপ থাকিতে হইবে।

দলীপসিংহ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হইয়া, বিলাত হইতে, তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ভাবে আপনার দুর্নিবার হৃদয়বেদনা পরিব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাইঃ—

"প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! ভারতবর্ষে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু সত্যগুরু সকলের বিধাতা। তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী। আমি তাঁহার ভ্রান্ত জীব। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাঁহার ইচ্ছায় ইঙ্গ্লণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, ভারতে যাইয়া, সামান্যভাবে বাস করিব। আমি সত্যগুরুর ইচ্ছার নিকটে মস্তক অবনত করিতেছি; যাহা ভাল, তাহাই হইবে।

"খাল্সাগণ! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু যখন আমি খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল।

একটি পবিত্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহ যে স্থানের যোগাসনে সমাসীন হইয়া স্বাধীনতার প্রাণরূপিণী পরমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন, রণজিৎ সিংহ যে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিয়া আপনার অসাধারণ ক্ষমতার মহিমায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এইরূপে তাহা পর-হস্তগত হইল। পঞ্জাব-কেশরীর পঞ্চনদ আজ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত, দেববাঞ্ছনীয় কহিনুর আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নের মধ্যে পরিগণিত, অতুল ধনসম্পত্তিপূর্ণ, বেদকীর্ত্তিত পবিত্র ভূমির অধিপতির পুত্র আজ ব্রিটিশ সিংহের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে সে গৌরব, সে মহত্ব, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যবন-রাজদিগকে পরাভূত করিয়া যে বিশাল রাজ্যে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল

"আমি বোম্বাই উপস্থিত হইয়া, শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিব। * * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলিব এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করিব।

"আমার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও, আমি পঞ্জাবে যাইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এইজন্য আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছি। সত্যগুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ওয়া গুরুজীকি ফতে,

প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ!

আমি আপনাদের নিজের মাংস ও রক্ত,

দলীপ সিংহ।"

করিয়াছিলেন, সে রাজ্য আজও ভারতের মানচিত্রে শোভা পাইতেছে, যে সপ্তসিন্ধুর মনোহর তটদেশ শিখদিগের বিজয়-পতাকায় শোভিত থাকিত, সে সপ্তসিন্ধু আজও অবিরামগতি প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু আজ সে অপূর্ব্ব সময়ের সে অপূর্ব্ব দৃশ্য নাই। সে সময় চির দিনের জন্য অতীতের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু সহৃদয়বর্গের স্মৃতি হইতে—পবিত্র ইতিহাসের হৃদয় হইতে শিখদিগের মহাপ্রাণতা ও শূরত্বের কাহিনী কখনও স্খলিত হইবে না। এই কাহিনী অনন্তকাল জীবলোককে গভীর উপদেশ দিবে। যদি ভারত-মহাসাগরের অতল জলে সমস্ত ভারতবর্ষ নিমগ্ন হয়, যদি হিমালয়ের অভ্র-ভেদী শৃঙ্গপাতে ভারতের সমস্ত দেহ সন্তাড়িত, নিষ্পেষিত ও বিচূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলেও শিখদিগের অনন্ত কীর্ত্তি অক্ষয় থাকিবে, তাহা হইলেও গুরু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ সিংহ ও শের সিংহের যশোগান এক সময়ে পৃথিবীর কোটী কোটী জীবের হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত হইবে।

তৃতীয় খণ্ড।

আর্য্যকীর্ত্তি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৬।

সূচী।

আর্য্যকীর্ত্তি।

লক্ষ্মীবাই।

লক্ষ্মীবাই খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রকৃত বীররমণী। যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, যখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সুবিস্তৃত ভূখণ্ড দৃপ্ত ব্রিটনের বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত, তখন লক্ষ্মীবাই বদ্ধমূল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া স্বাধীনতার গৌরবরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন এবং আপনার অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় যেমন কমনীয় কামিনী-জনোচিত মধুরতা ও স্নিগ্ধতায় আর্দ্র ছিল, তেমনি স্থিরতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায় উহা অটল হইয়া উঠিয়াছিল। যদি কেহ মাধুর্য্যময় কোমল সৌন্দর্য্যের সহিত ভয়ঙ্কর ভাবের সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলের অঙ্গবিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণা-ধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্ব্বতবিদারী ভৈরব রব শুনিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাই তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের অদ্বিতীয় আস্পদ বলিয়া পরি-

গণিত হইবেন। এই লাবণ্যময়ী বীরাঙ্গনার বীরত্বকাহিনী শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

লক্ষ্মীবাই কে? তিনি কি জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন? যে শক্তির প্রভাবে দিগ্বিজয়ী মরহাট্টারা মস্তক অবনত করিয়াছিল, পঞ্জাবকেশরীর পঞ্চনদ পূর্ব্ব-গৌরব-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, বাঙ্গালা ও বিহারের শ্যামল ভূমিতে, মাদ্রাজ ও বোম্বাইর সমৃদ্ধ স্থলে, সিন্ধু ও মধ্যভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পতাকা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে বিকাশ পাইতেছিল এবং ইঙ্গ্‌লণ্ডের বণিক্‌সমাজের এক জন কর্ম্মচারীর ক্ষমতা বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা ভোজের ক্ষমতার গৌরব-স্পর্দ্ধিনী হইতেছিল, কি জন্য সেই মহাশক্তি পর্য্যুদস্ত করিতে উদ্যত হন? এ স্থলে তাহা উল্লেখ করা উচিত হইতেছে।

ভারতের মানচিত্রের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অবস্থান দেখা গিয়া থাকে। ঝাঁসি প্রকৃতির রমণীয় স্থানে অবস্থিত। উহার উত্তর ও দক্ষিণ, দুইদিকেই সমুন্নত পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশ হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত। স্থানে স্থানে প্রশস্ত জলাশয় অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ১,৫৬৭ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে ঝাঁসি মহারাষ্ট্র কুল-গৌরব পেশবার আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্ট্রবংশীয়ের শাসনাধীন ছিল; পরে ১৮১৭ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত উহার সংস্রব জন্মে। ঝাঁসির শেষ অধিপতির নাম গঙ্গাধর রাও। ইনি ১৮৩৮

অব্দে ঝাঁসির গদিতে আরোহণ করেন। লক্ষ্মীবাই এই গঙ্গাধর রাওর পত্নী।

১৮৫৩ অব্দে গঙ্গাধর রাওর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এ জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে যথানিয়মে একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকটে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখেন;—"আমি এখন সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেও এত দিনের পর আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, আমার বড় মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। আমি এই জন্য, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয় ধারা অনুসারে আনন্দ রাও নামে আমার একটি পঞ্চমবর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় ও আপনার গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমি রোগ হইতে মুক্ত হই, আমি যেরূপ তরুণবয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্য করিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন, তাঁহার প্রতি যেন কখনও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার প্রদর্শিত না হয়।"

মুমূর্ষু গঙ্গাধর রাওর লেখনী হইতে এইরূপ বিনয়-নম্র বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, এইরূপ সৌজন্য তাঁহার জীবনের শেষ লিপির প্রতি অক্ষর উদ্ভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু মুমূর্ষুর

এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডাল-হৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। যিনি সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রণজিতের রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, যাঁহার রাজনীতির মহিমায় সেতারা-রাজ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-বংশীয়ের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এক্ষণে ঝাঁসির বিচার-ভার তাঁহারই হাতে আসিল। ডালহৌসী অবসর বুঝিয়া সেতারার ন্যায় ঝাঁসি গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে আদেশলিপি প্রচারিত হইল। ঝাঁসি ডালহৌসীর সর্ব্ব-সংহারিণী লেখনীর আঘাতে রাও-বংশীয়ের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল।

ঝাঁসি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইল বটে, কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত হইলেন না। তাঁহার রাজ্য পর-হস্তগত হইয়াছে, পরদেশীয় পরপুরুষ অবলীলায়—অম্লানভাবে তাঁহার দত্তক পুত্রের অধিকার বিলুপ্ত করিয়াছে, ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। এ মর্ম্মজ্বালা অমনি নির্ব্বাপিত হইল না। লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় অতি উচ্চ-ভাবে পূর্ণ ছিল। মেজর মাল্‌কমের ন্যায় ব্যক্তিও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "লক্ষ্মীবাই সাতিশয় মাননীয়া ও রাজ-প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী। তাঁহার স্বভাব অতি উচ্চ-ভাবের পরিচায়ক। ঝাঁসির সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান দেখাইয়া থাকে।" এই উচ্চ প্রকৃতির বীরাঙ্গনা স্বীয় রাজ্য রক্ষাকরিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন, সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তকগ্রহণের বিধি দেখাইয়া ঝাঁসির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আগ্রহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে

সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা বা সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। এই অবিচারে ও অবমাননায় লক্ষ্মীবাই সাতিশয় ব্যথিত হইলেন তাঁহার হৃদয়গত ব্যথা কেবল নয়ন-জলের সহিত বিলীন হইল না, অবিলম্বে উহা হৃদয়ের প্রতিস্তরে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছে, অটলতা যাঁহার হৃদয় অবিচলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং অধ্যবসায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির আক্রমণ সহ্য করিবার উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে, তিনি কখনও কোন প্রকার বিপদে কর্ত্তব্য-বিমুখ হইয়া ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দেন না। লক্ষ্মীবাই এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন। সুতরাং তিনি আপনার দশা-বিপর্য্যয়েও দৃঢ়তর অধ্যবসায় হইতে বিচ্যুত হইলেন না। ব্রিটিশ এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎকালে লক্ষ্মীবাই সক্রোধে বজ্র-গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "মেরি ঝাঁসি দেঙ্গে নেহি।" লক্ষ্মীবাইয়ের এই ধ্বনিতে ব্রিটিশ এজেন্টের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। এজেন্ট এই বীররমণীর দৃঢ়তায় স্তম্ভিত হইলেন। ঝাঁসি কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হইল, কিন্তু এই অবমাননা-রেখা বীরজায়া বীরাঙ্গনার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহি-যুদ্ধের সময় যখন ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়, কাণপুর, মিরাট, লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর সঙ্গে সঙ্গে যখন বুন্দেলখণ্ডও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তখন তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই আপনার প্রনষ্ট গৌরবের উদ্ধারসাধনে

যত্নবতী হন। যে তুষানল তাঁহার হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা এই সময়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। লক্ষ্মীবাই এই সময়ে কামিনীর কমনীয় বেশ পরিত্যাগ করিলেন। যুদ্ধবেশে এখন তাঁহার লাবণ্যময় দেহ সজ্জিত হইল। তদীয় সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী ভগিনী এখন তাঁহার সহকারিণী হইলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের যুবতী বীরাঙ্গনা সুশিক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। বৈদেশিকের কঠোর লেখনী হইতে যাহাই নির্গত হউক না কেন, সহৃদয় কবি ও সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিকের নিকটে এ চিত্র চিরকাল পবিত্র বলিয়া সম্পূজিত হইবে। কে ভাবিয়াছিল, প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে, ভারতে আবার এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইবে? কে ভাবিয়াছিল, এই পরাধীনতার সময়ে ভারতের কোমলতাময়ী যুবতী অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়া হইয়া, কোমল হস্তে কঠোর অস্ত্র ধরিয়া মহাশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইবেন? যে কমনীয় বহ্নি-শিখা লোক-লোচনের তৃপ্তি জন্মাইতেছিল, কে ভাবিয়াছিল, তাহা সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ভৈরবরবে চারি দিক দগ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে? অধিক দিন অতীত হয় নাই, ভারতে এইরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারত-বাসীর মধ্যে এইরূপ জ্বলন্ত পাবক-শিখার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতের যুবতী বীর-রমণী যৌবনের বিলাস পরিহার করিয়া এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ণ-বিকশিত শতদল এইরূপ কঠোরতায় পরিণত হইয়াছিল।

লক্ষ্মীবাই বীরপুরুষের বেশ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার

কোমল দেহ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল, কোমলহস্তে কঠোর অসি শোভা পাইতে লাগিল। সৌন্দর্য্যলীলাময়ী ললনার লাবণ্য-রাশি এখন অপূর্ব্ব ভীষণতার সহিত মিশিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক! দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ হতাশ ভারতের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে একবার ঐ অপূর্ব্ব ভাবের বিষয় চিন্তা কর, কল্পনার নেত্রে একবার ঐ ভয়ঙ্করী মহাশক্তির দিকে চাহিয়া দেখ। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব—অচিন্ত্যপূর্ব্ব—অনাস্বাদিতপূর্ব্ব কি এক অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মীবাই বীরপুরুষের বেশে অশ্ব-পৃষ্ঠে অধিরূঢ়া হইয়া, আপনার মরহাট্টা সৈন্যদিগকে পরিচালনা করিলেন। ব্রিটিশ সেনার সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। লক্ষ্মীবাই এই সংগ্রামে কিছুমাত্র কাতরতা দেখান নাই। তিনি কয়েক মাস নির্ভয়ে, অসীমসাহসে, ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। সুদক্ষ ব্রিটিশ সেনাপতি এই বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার অদ্ভুত রণ-কৌশল ও অসামান্য সাহসে বিস্মিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার যশোগানে প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্মীবাই ব্যতীত কোনও সেনাপতি রণক্ষেত্রে স্যার হিউরোজকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করেন নাই। প্রথম যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই আপনার অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রাম-নৈপুণ্যে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউরোজের সৈন্যদল বিশৃঙ্খল ও হতবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এ নির্জীব ভারতে কোন্ সহৃদয় ঐতিহাসিক এই অনন্ত কীর্ত্তির কাহিনী অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিবেন? ভারত-ভূমি যথার্থই বীর্য্যবহ্নির বিকাশ-ক্ষেত্র, ভারতের বীরাঙ্গনা যথার্থই জগতে অতুলনীয়া। যাঁহারা মহাসংগ্রামে নেপোলিয়নের ন্যায় অলোক-

সামান্য বীরপুরুষকেও হতগৌরব করিয়াছিলেন, ভারতের বীর-রমণী তাঁহাদের সৈন্যদল নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হন। প্রচণ্ড নিদাঘের ভয়ঙ্কর সময়ে ভারতের মহাশক্তি ব্রিটিশ সেনাপতির শক্তিনাশে উদ্যত হইয়া উঠেন। এ অপূর্ব্ব ভাবের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করা সকলের সাধ্য নহে। বহু সৈন্য নষ্ট হইলেও লক্ষ্মী-বাইয়ের তেজস্বিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; তিনি আবার মহা-পরাক্রমে কল্পিনগরে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু শেষে কল্পি ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত হয়। লক্ষ্মীবাই ইহাতেও উৎসাহ বা উদ্যমশূন্য হন নাই। যাহারা তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহার পুত্রকে সামান্য লোকের অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে, যে কোন প্রকারে হউক, তাহাদের ক্ষমতা নষ্ট করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্মীবাই ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বীররমণীর এ প্রতিজ্ঞা কখনও স্খলিত হয় নাই—বীরত্বের এ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কখনও কোন রূপ কালিমার ছায়া স্পর্শে নাই। ১৮৫৮ অব্দের ১৭ই জুন লক্ষ্মীবাই গোবালিয়রের নিকটে আবার ইঙ্গরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন, আবার ভৈরবরবে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধই বীররমণীর জীবনের শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শেষেই বীর-রমণীর পবিত্র জীবন-স্রোত স্বর্গীয় অমৃত প্রবাহে মিশিয়া যায়। এই যুদ্ধেই বীরাঙ্গনার অসাধারণ পরাক্রম দেখিয়া স্যার্ হিউ-রোজ কহিয়াছিলেন, "লক্ষ্মীবাই যদিও রমণী, তথাপি তিনি বিপক্ষদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিনী ও সর্ব্বাপেক্ষা রণ-পারদর্শিনী।"। বীরপুরুষ বীরাঙ্গনার প্রকৃত বীরত্ব বুঝিতে

পারিয়াছিলেন, তাই সম্মানের সহিত প্রকৃত বীরত্বের ঐ রূপ গৌরবরক্ষা করেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লক্ষ্মীবাই ও তাঁহার ভগিনী আপনাদের সৈন্য-দলের অগ্রভাগে ছিলেন। উভয়েই বর্ম্মাচ্ছাদিত, উভয়েই অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়, এবং উভয়েই বীরপুরুষের বেশে সজ্জিত। ঘোরতর সংগ্রামের পর উভয়ে যখন রণ-ভূমি হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ তুরুকসওয়ারের গুলিতে অথবা অসির আঘাতে উভয়েরই প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়। রণক্ষেত্রে এই বীরাঙ্গনাদ্বয়ের পতন ব্রিটিশ সেনাপতির নয়নগোচর হয় নাই। শেষে ইহাঁদের রক্তাক্ত দেহ পবিত্র সমর-ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল। মৃতদেহ রক্ষার জন্য লক্ষ্মীবাইয়ের বিশ্বাসী দেহরক্ষকগণ প্রাণপণ করিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত হইল। দেখিতে দেখিতে পরমসুন্দরী বীর-রমণী যুগলের দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। লক্ষ্মীবাইয়ের জীবন-নাটকের এই শেষ অঙ্ক কি গভীর ভাবের উদ্দীপক! আপনার স্বাধীনতার জন্য যুবতী বীররমণীর এই রূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ কি গভীর উপদেশের পরিপোষক! হায়! এ গভীর ভাবে কে প্রমত্ত হইবে? এ গভীর উপদেশে কে কর্ণপাত করিবে? লক্ষ্মীবাই ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি না। তাঁহার অসামান্য বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।
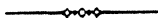
বালকের বীরত্ব।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লী সম্রাট্ আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধ করেন, চিতোরের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অধিপতি লক্ষ্মণ সিংহের খুল্লতাত ভীমসিংহ যখন আপনার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্যরক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন, তখন একটি বীর বালক অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়, আত্ম-সম্মান—আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, গরীয়সী বীরভূমির গৌরববৃদ্ধির নিমিত্ত, নির্ভয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যবন সৈন্য নিপীড়িত ও নির্ম্মূল করে। এই বীরবালক বীরত্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, ইঁহার বীরত্বকাহিনী প্রকৃত কবির রসময়ী কবিতায়, প্রকৃত ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় গ্রথিত হইবার যোগ্য।

দুরন্ত যবন বীরভূমির দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, ভীমবেশে ভীমসিংহের বনিতার মর্য্যাদানাশ করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। আজ বীরভূমি উন্মত্ত—আজ রাজপুত বীরেরা বংশের গৌরব রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত। যবন পদ্মিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যের কথায় মোহিত হইয়াছে, অলৌকিক গুণ-গৌরবের বর্ণনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; এ মোহ, এ উত্তেজনার আবেগে সে আজ চিতোর আক্রমণ করিতে সমুদ্যত, অকলঙ্ক রাজপুতবংশে কলঙ্কের কালিমা ছড়াইতে সমুত্থিত। কিন্তু তাহার আশা ফলবতী হইল না। চিতোর অধিকারে অকৃতকার্য্য হইয়া আলাউদ্দীন অবশেষে পদ্মিনীকে ক্ষণকালমাত্র দেখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজপুত বীর, দর্পণে প্রতি-

ফলিত প্রতিবিম্ব দেখাইবার প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে অলাউদ্দীন অসম্মত হইলেন না, বন্ধুভাবে চিতোরের প্রাসাদে আসিয়া পদ্মিনীর পদ্মকান্তির প্রতিবিম্ব দেখিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহার লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইল, মুহূর্ত্তমাত্র লাবণ্যময়ী ললনার অনুপম লাবণ্যসাগরে তাঁহার হৃদয় ডুবিয়া গেল। আলাউদ্দীনের আশা চরিতার্থ হইল, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে পদ্মিনীর মোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল না। আলাউদ্দীন কৃত্রিম বন্ধুতা দেখাইয়া ভীমসিংহকে চিতোরের গিরি-দুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। সরলহৃদয় রাজপুত যবনের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না, বন্ধুভাবে আলাউদ্দীনের সঙ্গে গেলেন। আলাউদ্দীন তখন সময় পাইয়া ভীমসিংহকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে আপনার শিবিরে লইয়া গিয়া বলিলেন, যাবৎ পদ্মিনী হস্তগত না হইবে, তাবৎ তাঁহাকে মুক্ত করা হইবে না।

পরাক্রান্ত ভীমসিংহ শত্রুর আয়ত্ত হইয়াছেন, যবন আবার পবিত্র কুলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে; আজ চিতোরের সকলেই বিষণ্ণ। কিন্তু রাজপুত বীর দীর্ঘ কাল বিষণ্ণতায় অভিভূত থাকিবার নহে। অবিলম্বে সকলে প্রসন্নভাবে ভীমসিংহকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতের প্রণয়িনী যবনের হস্তগত হইবে, যবন অবলীলায় সৌন্দর্য্য-গরিমার—সতীত্ব গৌরবের মর্য্যাদা নষ্ট করিবে, পবিত্র ফুটন্ত কুসুম যবনের স্পর্শে কলঙ্কিত হইবে, ইহা রাজপুত বীর প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারে না। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে বীরবালক বাদল আপনাদের মর্য্যাদারক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। দ্বাদশবর্ষীয় বীর অবিচলিত সাহসের

সহিত জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া, দুরন্ত শত্রুর হস্ত হইতে ভীমসিংহকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তদীয় খুল্লতাত গোরা প্রফুল্ল-হৃদয়ে এই মহৎ কার্য্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহকারী হইলেন।

আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া আপনার বিশ্বাস-ঘাতকতায় আপনি আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, চিতোর-লক্ষ্মী পদ্মিনী বহুসংখ্য দাসী সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। খিলজী সম্রাট্ সংবাদ পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন, অধীরভাবে কল্পনার নেত্রে কত সম্মোহন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একে একে সাত শত শিবিকা তাঁহার শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সকল শিবিকায় পরিচারিকার পরিবর্ত্তে চিতোরের সাহসী বীরগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুসময়ে এই সকল বীর শিবিকা হইতে বাহির হইয়া আপনাদের সম্মানরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিল। অদূরে যবন-সৈন্য অবস্থান করিতেছিল, রাজপুতগণের সহিত তাহাদের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। বাদল সাহসী রাজপুতদিগের অধিনেতা হইয়া আপনার বীরত্বের একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। দ্বাদশবর্ষীয় বীর-বালকের লোকাতীত পরাক্রমে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যবনসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যবনেরা বালকের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল। গোরা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহকারী ছিলেন। পবিত্র সমরক্ষেত্রে তাঁহার পতন হইল। বাদল খুল্লতাতকে সমরশায়ী দেখিয়াও হতাশ ও হতোদ্যম হইলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত অশ্বচালনা করিয়া শত্রুসেনা ধ্বংস

করিতে লাগিলেন। এক দিকে দিল্লীর সম্রাটের বহুসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের অধীনে কয়েক শত রাজপুত বীর। মাতার কোমল ক্রোড়ে যে লালিত হওয়ার যোগ্য, সে আজ গরীয়সী বীরভূমির সম্মানরক্ষার জন্য, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও দুর্ভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া ভীম-পরাক্রম শত্রুর সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে অধিরূঢ়; যাহার সুগঠিত দেহ অপরিস্ফুট কমলের ন্যায় লোক-লোচনের তৃপ্তিকর, সে আজ কঠোরপ্রকৃতি শত্রুর কঠোর অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিবারের পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এইরূপ পবিত্র দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের অপার পবিত্রতা কে আজ হৃদয়ঙ্গম করিবে? কে আজ বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় এই বীরবালকের অনন্ত কীর্ত্তির মহিমাময় মহাগীতি হৃদয়ভেদী কণ্ঠে নির্জ্জীব, নিষ্পীড়িত ভারতের গৃহে গৃহে গাইয়া বেড়াইবে?—অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, বীর বালক অবিশ্রান্তভাবে আপনার লোকাতীত বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বিজয়লক্ষ্মী বালকের অপূর্ব্ব বীরত্বে আকৃষ্টা হইলেন। ভীমসিংহ শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। দুরন্ত আলাউদ্দীনকে পদ্মিনীর অধিকারের আশায় আপাততঃ জলাঞ্জলি দিতে হইল। বাদল ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত-কলেবরে গৃহে উপনীত হইলেন। মাতা অপার আনন্দের সহিত পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বীরবালক জীবনের পবিত্র ব্রত সম্পাদন পূর্ব্বক এই রূপে গৃহে আসিয়া, খুল্লতাতের পত্নীর কাছে তদীয় স্বামীর অদ্ভুত বীরত্ব ও পরাক্রমের কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গোরার বনিতা স্বামীর বীরত্বের কথায়

প্রফুল্ল হইয়া, হাসিতে হাসিতে পরলোক-গত দয়িতের উদ্দেশে অনল-কুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। ভারতের বীর-বালক এক সময়ে এই রূপ বীরত্ব ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিল। বীরবালকের এই বীরত্ব-কীর্ত্তি চিরকাল জীবলোককে গভীর ভাবের উপদেশ দিবে। নিস্তেজ ভারত আজ এ গভীর উপদেশ, বিনশ্বর শরীরীর এ অবিনশ্বর কীর্ত্তির কথা শুনিবে কি ?

বীরাঙ্গনা।

দুরন্ত সাহাবদ্দীন গোরী যখন ভারতে উপস্থিত হয়, তখন বীর্য্যবন্ত আর্য্য-পুরুষেরা গরীয়সী জন্মভূমির রক্ষায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ, আফ্‌গান শত্রুকে ভারত-ভূমি হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য, সমরসজ্জার আয়োজন করেন; মিবারের অধিপতি পরাক্রান্ত সমরসিংহ, প্রিয়তম পুত্র ও বহুসংখ্য সাহসী সৈন্যের সহিত তাঁহার সহযোগী হন। দিল্লী ও মিবারের যোদ্ধারা একত্র হইয়া এক পবিত্র উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য পুণ্য-সলিলা দৃশদ্বতীর তটে সমাগত হয়। যে প্রশস্তহৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাচীন আর্য্যগণ জলদ-গম্ভীর মধুর স্বরে বেদ গান করিতেন, যেখানে যোগাসনে সমাসীন হইয়া যোগ-রত আর্য্য-তাপসগণ পরমা শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, আজ সেই পবিত্র স্রোতস্বতীর তটে বীর্য্যবন্ত আর্য্যগণ জীবনের মহত্তর কার্য্যসাধন জন্য একত্র হইলেন। কিন্তু এই মহত্তর কার্য্য

সফল হইল না। দুরন্ত আফগানের চাতুরীতে হিন্দুদের পরাজয় হইল, দৃশদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিল। পৃথ্বীরাজ নিহত হইলেন। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পবিত্র সমর-ক্ষেত্রে পরাক্রান্ত সমরসিংহের পতন হইল। তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের, তাঁহার সাহসীদিগের মধ্যে সাহসীতর সৈন্যের দেহ-রক্ত নদীসৈকতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আফগানেরা দিল্লী অধিকার করিল, কান্যকুব্জে জয়পতাকা উড়াইয়া দিল, অবশেষে পুণ্য-ভূমি রাজপুতনায় উপস্থিত হইল।

পবিত্র সমরে পবিত্রাত্মা সমরসিংহ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আজ মিবার অন্ধকার। দুরন্ত শত্রু দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, আজ বীর-ভূমি শোক সাগরে নিমগ্ন। রাজপুতনার প্রত্যেক স্থানে নর-শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রত্যেক স্থান বিধর্ম্মী যবনের আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। তেজস্বিতার—পবিত্রতার—স্বাধীনতার আশ্রয় ক্ষেত্র আজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত—আজ আফগানের অত্যাচারে মহাশ্মশানের সদৃশ। এই বিপত্তিপূর্ণ সময়ে সহসা কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তির মহিমায় ঘটনা-স্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল, সহসা বীরভূমি বীর্য্যমদে মাতিয়া উঠিল। মিবার আপনার গৌরবরক্ষার জন্য নবীন উৎসাহের সহিত সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল, মিবারের মহাশক্তিরূপিণী যুবতী বীরাঙ্গনা বীরসাজে সাজিয়া যবনের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইলেন।

এই মহাশক্তিরূপিণী যুবতী কে? মহারাজ সমরসিংহের বনিতা—কর্ম্মদেবী। সমরসিংহের অন্যতম পুত্র—মিবারের

উত্তরাধিকারী কর্ণ এই সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র যবনের পদদলিত হইবে, সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ নিরীহ জীব শত্রুর হস্তে লাঞ্ছনা পাইবে, শত্রু অবলীলায় হৃদয়রঞ্জন কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ফেলিবে, ইহা কর্ম্মদেবী সহিতে পারেন না। কর্ম্মদেবী আজ শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিতে উদ্যত। সমরসিংহ সমরে লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহার বিধবা রমণী আজ স্বামীর পবিত্র ধর্ম্মরক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কর্ম্মদেবী বীরবেশ পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দেহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল, তাঁহার হস্তে সুতীক্ষ্ণ অসি শোভা বিকাশ করিতে লাগিল; বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার অনুপম লাবণ্যরাশি আজ অনুপম ভীষণতার সহিত মিশিয়া গেল। বহুসংখ্য রাজপুত, বীরাঙ্গনার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। সাহাবদ্দীন গোরীর প্রিয়পাত্র কোতবদ্দিন ইবক্ রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে বীরাঙ্গনা আপনার বীরত্বের একশেষ দেখাইলেন। তাঁহার আক্রমণে যবন-সৈন্য নষ্ট হইতে লাগিল। যবনের পরাক্রম ক্ষীণতর হইয়া আসিল। কোতবদ্দিন যুদ্ধক্ষেত্রে লাবণ্যময়ী যুবতীর ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আর তাহার জয়ের আশা রহিল না। কর্ম্মদেবী অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুকে নির্জ্জীব করিলেন। বিজয়-লক্ষ্মীর মহিমায় তাঁহার দেহ-লক্ষ্মী অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। কর্ম্মদেবী মিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। দিল্লীর প্রথম মুসলমান সম্রাটকে বীরাঙ্গনার পরাক্রমে পরাজিত ও আহত হইয়া রণ-স্থল

পরিত্যাগ করিতে হইল। একসময়ে মিবার এইরূপে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, মিবারের বীর-রমণী এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছিলেন। এ অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী পবিত্র ইতিহাস হইতে কখনও স্খলিত হইবে না। মিবার যথার্থই এইরূপ বীরত্ব-গরিমার লীলা-ভূমি। সহৃদয় ঐতিহাসিক যথার্থই কহিয়াছেন, "শত দোষ থাকিলেও, মিবার! আমি তোমায় ভালবাসি।"

সন্তোষ-ক্ষেত্র।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কাহিনী যাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের কীর্ত্তিকলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে বিনম্রভাবে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধবিগ্রহেই শেষ হয় নাই। তিরৌরী বা হলদিঘাট, দেবীর বা নওশেরা, রামনগর বা চিলিয়ানবালার পুণ্যপুঞ্জময় ক্ষেত্র কেবল তাঁহাদের অবিনশ্বর কীর্ত্তিতে ইতিহাসের বরণীয় হয় নাই। বীরত্ব-বৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় ও দানশীলতাপ্রভৃতি গুণে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকটে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ

প্রভৃতির ধর্ম্ম-নিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, এবং শিলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতার অপূর্ব্ব মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ ভারতের ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার কয়েকটি কথা এ স্থলে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে, যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার বিজয়-পতাকায় শোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ ভুজ-বলের মহিমায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, চীন দেশের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক হিউএন্ থসঙ্গ যখন নালন্দা-নামক স্থানের পবিত্র বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ শীল-ভদ্রের পদতলে বসিয়া হিন্দু আর্য্যগণের অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমার সৌন্দর্য্য রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, তখন মহারাজ শিলাদিত্য গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থলে, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ-প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঐ মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘ কাল হইতে ঐ ভূমি "সন্তোষ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিট-পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছ পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজন-গৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা

পাইত। এক একটি ভোজন-গৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয়-বন্ধু-শূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজ-গণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি ও আসাম-রাজ ভাস্করবর্ম্মা ঐ করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ দুই করদ ভূপতির ও মহারাজ শিলাদি-ত্যের সৈন্য সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ-সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষ-ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় উহার চারি দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলের ঠিক পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্য স্থাপন করিতেন। আর ভাস্কর-বর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈনিক দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অব-মাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু

দেবমূর্ত্তি, উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরিত হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা এবং দশ দিন ব্যাপিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধু-শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণি মুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণকরিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীরস্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায়

সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্র-স্বভাব চীনদেশীয় শ্রমণ হিউএন্থ্ সঙ্গ্ ঐইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজারা ধর্ম্ম-সঞ্চয়মানসে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন, ইহাঁদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোন রূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত। উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইহাঁরা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন। এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও ঐ অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই রূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। অধিকন্তু যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া,

শেষ রাজসিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষ-ক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া, আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য-কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইঙ্গ্‌রেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গড়াইয়া না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ, যদি আপনাদের জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে ঐ প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তির অপূর্ব্ব আড়ম্বর দেখা যাইত, আজও ঐ অপূর্ব্ব দান-শীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে দুলিতে থাকিত। ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ কয় জন ভারতবাসী ইহার জন্য নীরবে, নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন? কয় জনের হৃদয় পূর্ব্ব-স্মৃতির তীব্র দংশনে কাতর হয়? কে ইহার উত্তর দিবে?

ফুলাসিংহ।

১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে যখন ইঙ্গ্‌রেজ-দূত স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ (পরে লর্ড মেট্‌কাফ্) অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ইঙ্গ্‌রেজ-সেনানী কর্ণেল অক্টরলোনীর সহিত একত্র হইয়া যখন তিনি গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টোর আদেশে মহারাজ

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এক জন সাহসী যুবক নির্ভয়ে নিষ্কোশিত তরবারি হাতে করিয়া আপনার কয়েক জন অনুচরের সহিত পঞ্জাব-কেশরীর নিকটে আসিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "মহারাজ! বিদেশী ইঙ্গরেজেরা আমাদের রাজ্যে আসিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা আমাদের যার-পর-নাই দুরবস্থা করিয়াছে—অপমান করিয়াছে, আমার অনুচরদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন, যদি এই মুহূর্ত্তে বিধর্ম্মীদিগকে সমুচিত শাস্তি না দেন, তাহা হইলে এই তরবারির আঘাতে আপনার সহিত আপনার বংশের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিব।" রণজিৎ সিংহ অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে যুবকের মুখে এই কঠোর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, সবিস্ময়ে যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, যুবক নির্ভয়ে তরবারি আস্ফালন করিতেছে, নির্ভয়ে বিস্ফারিত চক্ষে আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অসময়ে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাবে পঞ্চনদের অধীশ্বর বিচলিত হইলেন না, আপনার ধীরতার সীমা অতিক্রম করিয়া চপলতার পরিচয় দিলেন না। তিনি স্নেহের সহিত ধীরগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "যুবক! তোমার সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু ইঙ্গরেজ-দূতের সহিত আমি বন্ধুতা-পাশে আবদ্ধ, তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, তোমার অসি আমার স্কন্ধেই পতিত হউক।" মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই স্নেহমাখা কথায় যুবকের উত্তেজিত হৃদয় কিছু শান্ত হইল। যুবক আর কোন রূপ উদ্ধতভাব না দেখা-

ইয়া উন্নত মস্তক অবনত করিল। রণজিৎ সিংহ সন্তোষের সহিত তাঁহাকে এক যোড়া স্বর্ণাভরণ ও তদীয় অনুচরদিগকে যথাযোগ্য দ্রব্য দিলেন। যুবক ধীরভাবে মহারাজ-প্রদত্ত মহা-প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল।

এই তেজস্বী যুবকের নাম ফুলাসিংহ। ফুলাসিংহ জাতিতে জাঠ। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ অকালী নামে যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন, ফুলাসিংহ সেই সম্প্রদায়ের লোক। অকালী-দিগের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ। ইহারা সাহসে অটল, বিক্রমে অজেয় ও কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে অনলস। শত্রুর ব্যূহ-ভেদে, শত্রুর দুর্গ অধিকারে ইহাদের কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ হয়, ইহা-দের কিরূপ ক্ষমতা-বলে বিপক্ষের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আইসে, তাহা ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহারা দুর্ব্বল গরিব দুঃখীর পরম বন্ধু ও অত্যাচারী ধনশালীর পরম শত্রু। কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে ইহারা আপনাদের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। গুরু গোবিন্দ সিংহ আপনার প্রতিষ্ঠিত এই মহাসম্প্রদায়ের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের ক্ষমতার গতি রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আর খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুলাসিংহ এই দলের অধিনেতা হইয়া ইহাদের সাহস, ইহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি ও ইহাদের বীরত্ব, পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে দিন ফুলাসিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সমক্ষে আপনার অসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন, সেই দিন হইতে অকালীদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তির সঞ্চার হয়। সেই দিন অকালীরা সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে আপনা-

দের অধিনেতার পদে বরণ করে। ক্রমে তাঁহার দল পুষ্ট হয়, ক্রমে প্রায় চারি শত অকালী সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ পালনে তৎপর হইয়া উঠে। ফুলাসিংহ ঐ অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া নানা-স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নিরাশ্রয় দুঃখী-দিগকে রক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে তৎপর হইলেন। যেখানে নির্ধন, নিরাশ্রয় ও নিপীড়িত ব্যক্তি দুঃসহ যাতনায় নিরন্তর দগ্ধ হইত, সেই খানেই রক্ষা-কর্ত্তা ফুলাসিং-হের আবির্ভাব হইতে লাগিল; যেখানে ক্ষমতাশালী ধনী বিলাসের তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে আপনার ধনবৃদ্ধির সুখময় স্বপ্ন দেখিতেন, সেই খানেই ফুলাসিংহ তাঁহার ধন গ্রহণ ও ক্ষমতা নষ্ট করিতে হাত বাড়াইতে লাগিলেন; যেখানে নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিঃসহায় অনাথিনী পবিত্র শোকের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ নির্জ্জন পর্ণ-কুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত এবং আপনার হৃদ-য়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার জন্যই যেন, নিরন্তর নয়ন-সলিলে সমুদয় দেহ প্লাবিত করিত, সেই খানেই ফুলাসিংহের দয়া তাহাকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফুলাসিংহের এই সমস্ত কার্য্যের বিবরণ ক্রমে পঞ্জাব-কেশরীর কর্ণগোচর হইল। রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের সহিত তাঁহাকে অপরের সম্পত্তিগ্রহণে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ফুলাসিংহ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। রণজিৎসিংহ তাঁহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেন, বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া শান্তিময় জীবনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে

লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার পরামর্শ, তাঁহার অঙ্গীকৃত পুরস্কার, তাঁহার বাক্‌চাতুরীর মোহিনী শক্তি, সমস্তই ফুলাসিংহের নিকটে পরাভব স্বীকার করিল। ফুলা-সিংহ বশীভূত হইলেন না। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় আপনার সাধনায় অটল থাকিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বিপন্নের বিপদ উদ্ধারে, দরিদ্রের দুঃখমোচনে এবং উদ্ধত ও গর্ব্বিত ধনীর গর্ব্ব-হরণে ব্যাপৃত হইলেন। এই সময়ে ফুলাসিংহের দলে চারি পাঁচ হাজার লোক ছিল। ইহারা সকলেই আপনাদের দল-পতির যে কোন আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বেশ্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফুলাসিংহকে ভয় দেখাইলে কোন ফল হইবে না। ধীরভাবে স্নেহের সহিত নানারূপ প্রলোভন দেখাইলে, তাহাকে বশে রাখা যাইতে পারিবে। রণজিৎসিংহ ফুলাসিংহের বিরুদ্ধে প্রথমে একদল সৈন্য পাঠাইলেও অবশেষে এই উপায় অবলম্বন করিলেন। এ উপায়ে তাঁহার বাসনা ফলবতী হইল। ফুলাসিংহ পঞ্জাব-কেশরীর অনুগত ও ক্রমে তাঁহার পরম প্রিয় পাত্র হইয়া উঠি-লেন।

এই সময় হইতে মহারাজ রণজিৎসিংহের ক্ষমতা পরি-বর্দ্ধিত হয়, এই সময় হইতে ফুলাসিংহ ও তাঁহার দলের লোকদিগের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া রণজিৎসিংহ দুর্জ্জেয় আফগানদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। তিনি অনেক যুদ্ধে এই সাহসী সৈন্যদলের বীরত্বে বিজয়-লক্ষ্মী অধিকার করেন। ফুলাসিংহের দলের একটি বীরপুরুষের লোকাতীত সাহসে মুলতান অধিকৃত হয় এবং ফুলাসিংহ নিজে

অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়া ভারতের নন্দনকানন কাশ্মীর হস্তগত করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন, বহুযুগের পর পঞ্চনদের হিন্দু ভূপতির অধীনে যখন হিন্দু সৈন্য নওশেরার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আফগানদিগের সম্মুখীন হয়, তখন ফুলাসিংহ যেরূপ লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়-লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং যেরূপ লোকাতীত সাহসের সহিত যবন সৈন্য নির্ম্মূল করিতে করিতে শেষে সেই নওশেরার সমরস্থলে—সেই পবিত্রতাময় পরম তীর্থে অকাতরে অম্লানভাবে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন, তাহা চিরকাল ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকার যোগ্য। এই মহাযুদ্ধে প্রথমে শিখদিগের পরাক্রম বিচলিত হইয়াছিল, প্রথমে পাঠানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। রণজিৎসিংহের ইউরোপীয় সেনাপতি বেণ্টুরা ও এলার্ডও প্রথমে আফগানদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে রণজিৎসিংহ বিপক্ষের গতিরোধ জন্য আপনার সৈন্যদিগকে একত্র করিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, ভৈরবরবে সৈন্যদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিক্রমে, অপূর্ব্ব স্থিরতায় ও অপূর্ব্ব সাহসে কোনও ফল হয় নাই। রণজিৎসিংহ অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন, সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে একাকীই তরবারি আস্ফা-

লন করিতে করিতে বিপক্ষের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে "ওয়া গুরুজি কি ফতে," এই আশ্বাস-বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এবাক্য দূরাগত বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর রবে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, একবারে আশা, ভরসা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। রণজিৎসিংহ সবিস্ময়ে বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ নীল বর্ণের পতাকা উড়াইয়া পাঁচ শত মাত্র অকালী সৈন্যের সহিত "ওয়া গুরুজি কি ফতে," শব্দ করিতে করিতে সেই গণনাতীত পাঠান-সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ফুলাসিংহকে বিপক্ষের গুলির আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঐ আঘাতে ফুলাসিংহের হাঁটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া যে, স্থানান্তরিত করিয়াছিল, রণজিৎসিংহ তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এবার তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার সৈন্য চালনা করিতেছেন। গুলির আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রশস্ত ললাটে ভীতি-ব্যঞ্জক রেখার আবির্ভাব নাই, বিস্তৃত লোচন-দ্বয়ে দুশ্চিন্তা বা নিরাশা-সূচক কালিমার আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিতেছেন, "ওয়া গুরুজি কি ফতে!" তাঁহার সৈন্যগণ গুরু গোবিন্দসিংহের মন্ত্রপূত, ঐ প্রাতস্মরণীয় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পাঠান সৈন্য নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের এই তেজস্বিতা দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর প্রীত, চমৎকৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কে বলে

গুরু গোবিন্দসিংহের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরু গোবিন্দ-সিংহের মহাপ্রাণতা তাঁহার দেহের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? খ্রীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, নওশেরার এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দসিংহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তদীয় জীবন্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্য এ সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ আজ গুরু গোবিন্দের মহাপ্রাণতায় মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার মন্ত্রপূত শোণিত অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিনশ্বর জগতে শিখ-গুরুর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎসিংহ ফুলাসিংহকে পাঠানের ব্যূহভেদে অগ্রসর দেখিয়া অসামান্য বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এবার ফুলাসিংহের পরাক্রম পাঠানেরা সহিতে পারিল না। অকালীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যবন-সৈন্য নির্ম্মূল করিতে লাগিল। ক্রমে রণজিৎ-সিংহের অপরাপর সৈন্য আসিয়া অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাহুতের শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত শক্রর মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিলেন। আহত মাহুত এবার আদেশপালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃপুনঃ আদেশেও মাহুত যখন অগ্রসর হইল না, তখন ফুলাসিংহ সক্রোধে মাহুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন। মাহুত পড়িয়া গেল। ফুলাসিংহ হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালনা করিয়া শক্রর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিয়া তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীর-কেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহার প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিনায়কের মৃত্যুতে অকালীগণ ছত্রভঙ্গ হইল না। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসসহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। আফগান-সৈন্য এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণ-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। নওশেরার সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহের লোকাতীত পরাক্রমে বিজয়-লক্ষ্মী পঞ্জাব-কেশরীর অঙ্কশায়িনী হইলেন।

পাঠানেরা যার-পর-নাই বিস্ময়ে ফুলাসিংহের এই লোকাতীত বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই একটি পরম পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই ঐ পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ই ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে ফুলাসিংহের উদ্দেশে স্তুতিবাদ করিতেন। যতদিন এক-চক্ষু বৃদ্ধ শিখ-ভূপতি জীবিত ছিলেন, ততদিন যখন নওশেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখনই তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইত, এবং তাহা হইতে অবিরলধারায় মুক্তাফল বাহির হইয়া গণ্ডদেশে পড়িত। বীর-ভক্ত বীর-কেশরী এইরূপ পবিত্র শোকাশ্রুতে ফুলাসিংহের পরলোকগত পবিত্র আত্মা সন্তৃপ্ত করিতেন।

অসাধারণ পরোপকার।

খ্রীঃ ১৮৭৫ সাল। সিপাহিরা উন্মত্ত হইয়া ইঙ্গরেজদিগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, চারি দিকে ভয়ঙ্করী শোণিত-তরঙ্গিণী অবাধে তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে, ইঙ্গরেজ ও সিপাহি, উভয়েই সময়ের উত্তে-জনায়, হিংসা ও ক্রোধের আবেগে, উভয়ের প্রতি নির্দ্দয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ বায়ুসন্তাড়িত সাগ-রের ন্যায় চঞ্চল, ভারতের সমস্ত অধিবাসী সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির। এই বিপত্তিপূর্ণ সময়ে ভারতের দয়াবতী রমণী অপূর্ব্ব দয়ার পরিচয় দেন, আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও বিদেশী, বিধর্ম্মী, নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজ কুলকামিনী ও শিশুদিগকে আশ্রয় দিয়া, জগতের সমক্ষে অসাধারণ পরোপ-কারের ও মানবী প্রকৃতিতে পবিত্র দেব-ভাবের মহিমা বিকাশ করেন।

বুঁদীর রাজার ধর্ম্ম-পরায়ণা বনিতার কোমল হৃদয়ে এইরূপ দেবভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। বুঁদী-রাজ সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে। যে সকল কুলবধূ ও শিশুসন্তান এক সময়ে সুখ-সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল, তাঁহারা এখন খাদ্য-বিহীন ও বস্ত্র-বিহীন হইয়া আশ্রয়-স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী

জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকটে আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহারের বিষয় তাঁহার গোচর হইল না। রাজমহিষীর সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থশরীরে দিল্লীস্থিত ইঙ্গরেজ সেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে, ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্যদানে যে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী বিপন্নের সাহায্য করিয়া, হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। কিন্তু হায়! এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদারতাই রাণীর জীবন-নাশের কারণ হইল। বুঁদী-রাজের প্রত্যাগমনের কিছু কাল পরে রাণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজাও ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্য-স্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে রাজার আদেশক্রমে রাণীকে বধ করা হয়। দয়াবতী অবলা ভূমণ্ডলে দয়ার অপার পবিত্রতা দেখাইয়া ঘাতকের হস্তে আত্মজীবন সমর্পণ করেন।

উল্লিখিত বিলুণ্ঠন, বিপ্লব ও নরহত্যার সময়ে স্বর্গীয় দয়া আর এক স্থলে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায়দিগের মধ্যে যেরূপ সুখ ও শান্তির অমৃতময় রাজ্য বিস্তার করে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ফয়জাবাদের ডেপুটী কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনা-নিবাসের সিপাহিগণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র একজন বিশ্বস্ত চাপরাশী দ্বারা আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া নদীর তটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন, এই চাপরাশী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইতেও আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া ডেপুটী কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনা-নিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী শিবিকা-রোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে নদী-কূলে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এই সময়ে সম্পত্তিলুণ্ঠন ও ইঙ্গরেজবিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘূরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইঙ্গরেজমহিলা সন্ধ্যা-সমাগমে একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লী-বাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিল। বাহকগণ এদিকে শিবিকা নদীর তটে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয় বিহ্বল চিত্তে সমস্ত রাত্রি সেই তুন্দুরের ভিতর লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহিরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে পলাতক ইঙ্গরেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে,

প্রাণ-সংহার করা হইবে বলিয়া, সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবন-হানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমল-হৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়া ইঙ্গরেজমহিলাকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিল না। যখন ঐ ইঙ্গরেজ-রমণী গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রাম-বাসিনী অধিকাংশ মহিলাই উহা জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহা প্রকাশ করিল না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নিবৃত্ত হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটী কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য সেই স্থানের অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া, এক খানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ বিপন্নের উদ্ধারার্থ ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটী কমিশনেরর পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা আপনাদের সন্তান-বর্গের সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহি বসিয়া রহিল, এবং এখানি তীর্থ-যাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা ঐ সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জ

ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এ স্থানেও পল্লীবাসিনীগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটি দয়াবতী রমণী, শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দ্রুত-গতি গ্রামে প্রবেশ করিল, এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদসহকারে ইহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। সিপাহিগণ জানিতে পারিলে এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্য-কারিণী মহিলাদিগের প্রাণ সংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাশক্তি সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হয়।

যাঁহারা পরোপকারের জন্য আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সহিত কোনরূপ পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা দেবভাবে পূর্ণ হইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ মহত্বের পরিচয় দেন। তাঁহাদের আবির্ভাবে, তাঁহাদের গৌরবে, তাঁহাদের অপার্থিব কার্য্যের অনন্ত মহিমায় এই রোগশোকময় ও দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ সংসার সুখের, শান্তির, প্রীতির অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ হইয়া উঠে। ভারতের অবলাগণ এক সময়ে পৃথিবীতে এইরূপ স্বর্গীয় ভাব বিকাশ করিয়াছিলেন, জীবনের মমতা পরিহার করিয়া অটল সাহস, অবিচলিত ধীরতা ও অপরিমেয় দয়ার সহিত নিরাশ্রয়, বিপদগ্রস্তদিগকে এইরূপ সুখ ও শান্তির পথে লইয়া গিয়া-

ছিলেন। সহৃদয়-সমাজে চিরকাল ইঁহাদের নিস্বার্থ হিতৈ-ষিতার সম্মান থাকিবে।
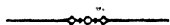
অবলার আত্মত্যাগ।

অনন্ত কাল-স্রোত অবিরাম গতিতে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের সে প্রবল প্রতাপ, সে দিগন্ত-বিশ্রুত গৌরব, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতি সম্রাট-গণের বংশধর শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত হইয়া মহাশ্মশান দিল্লীর এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়া-ছেন। ব্রিটিশ সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজগণের হৃদয়ে গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের ভূপতি—সিন্ধিয়া ও হোলকর দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে যাইয়া আপনাদের অধিকারবিস্তারে উন্মুখ হইয়াছেন। এই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময়ে ভীমসিংহ মিবারে আধিপত্য করিতে ছিলেন। ভীমসিংহের পূর্ব্বপুরুষোচিত সে ভীম পরাক্রম ছিল না। অতুল-ক্ষমতা-শালী, বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওর বংশের সন্তান আপনাদের চিরন্তন তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া, মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভূপতিগণ সৈন্যদল লইয়া রাজস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আক্রমণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পবিত্র জনপদ, শোকের, দুঃখের ও দারিদ্র্যের

রঙ্গ-ভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতাপসিংহ বা পুত্র, জয়মল্ল বা বাদল, এখন কেবল রাজপুতের স্মৃতিতে বিরাজ করিতেছিলেন। সে তেজস্বিতা, সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এখন রাজস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছিল। কিন্তু এই শোচনীয় সময়েও একটি স্বর্গীয় কুসুম রাজস্থানে বিকশিত হইয়া আপনার পবিত্রতার মহিমায় সকলকে পবিত্র করিয়াছিল; ষোড়শী রাজপুতবালা কৃষ্ণকুমারী পিতার রাজ্য রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পূর্ব্বগৌরব-ভ্রষ্ট, পরপীড়িত রাজস্থান অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী রাণা ভীমসিংহের কন্যা। সৌন্দর্য্য-গৌরবে তিনি অতুলনীয়া ছিলেন। লোকে তাঁহাকে "রাজস্থানের কুসুম" বলিয়া গৌরবান্বিত ও সম্মানিত করিত। তাঁহার যেমন অসাধারণ রূপ-লাবণ্য, তেমনি অনুপম দেশ-ভক্তি ছিল। কৃষ্ণকুমারী ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে রাজা ভীমসিংহ মাড়বারের অধিপতির সহিত কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে মাড়বার্ রাজের পরলোক প্রাপ্তি হয়। সুতরাং ভীমসিংহ জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহের হস্তে দুহিতা-রত্ন সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। মাড়বারের পরবর্ত্তী ভূপতি মানসিংহ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে মিবারে আসিয়া রাজস্থান-কুসুম কৃষ্ণার পাণিগ্রহণার্থী হন। এদিকে মহারাজ সিন্ধিয়া জয়পুর-রাজের পরিবর্ত্তে মাড়বার-রাজের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে মহারাজ ভীমসিংহকে অনুরোধ করেন। জগৎসিংহের সহিত সিন্ধিয়ার শত্রুতা ছিল। ঐ শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া সিন্ধিয়া জয়পুরের অধিপতিকে বঞ্চিত করিয়া

মাড়বার-রাজের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য মহারাজ ভীম-সিংহকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভীম-সিংহ সম্মত হইলেন না। সিন্ধিয়া সৈন্যদলসহ উদয়পুরে আসিয়া একটি গিরি-সঙ্কটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উদয়পুর ও জয়পুরের সৈন্যগণ তাঁহার পরাক্রম খর্ব্ব করিতে পারিল না। ভীমসিংহ পরিশেষে একলিঙ্গের পবিত্র মন্দিরে সিন্ধিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রবলের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। রাণা জয়পুররাজের দূতকে বিদায় দিলেন। জগৎসিংহ এ অপমান সহিতে পারিলেন না। অবি-লম্বে তাঁহার বহুসংখ্য সৈন্য মিবারে উপস্থিত হইল। এ দিকে মাড়বার-রাজ মানসিংহও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বীর-ভূমি অপূর্ণ-বিকশিত পবিত্র রাজস্থান-কুসুমের জন্য নর-শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল।

এই যুদ্ধে মানসিংহ প্রথমে জয়ী হইতে পারিলেন না। এক দল লোক প্রবল হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিল। ইহারা আর এক জনকে অধিপতি করিয়া মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মানসিংহ ১,২০,০০০ সৈন্যের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বীর সম্মুখে আসিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মাড়বারের অধিকাংশ লোক বিপক্ষের দলে যাইয়া মিশিল। এইরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতায় মানসিংহ ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে হস্তস্থিত অসি দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েক জন বিশ্বাসী সর্দ্দার অসি কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে স্থানান্তরিত করিলেন। শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তদীয় রাজধানী আক্রমণ

করিল। পরাক্রান্ত রাঠোরগণ অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের সহিত গরীয়সী জন্মভূমি রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে তাহাদের রাজধানী শত্রুর হস্তগত ও বিলুণ্ঠিত হইল। মানসিংহ যোধগড়ে আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ অভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন সময়ে দুর্গের ঐ গৌরব সর্ব্বাংশে রক্ষিত হইল। মাড়বারের রাজধানী আক্রমণকারী সৈন্যগণের পদানত হইল বটে, কিন্তু যোধগড় আপনার গৌরবের মহিমায় অটল ও অজেয় রহিল।

এই বিপ্লবের সময়ে মানব-সংজ্ঞাধারী একটি পশু-প্রকৃতি নিকৃষ্ট জীব রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হইল। ইহার নাম আমির খাঁ। আমির খাঁ জাতিতে পাঠান। পাপের ভয়াবহ রাজ্যে যত প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি আছে, তৎসমুদয়েই আমির খাঁর প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল। আমির খাঁ প্রথমে মানসিংহের বিপক্ষের পক্ষে ছিল। মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী ঐ দুরাচার নরাধমকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে ঐ পাষণ্ড বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতায় তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তদীয় সৈন্যগণ নির্ম্মূল হইয়া গেল। আমির খাঁ অম্লানভাবে এইরূপে পাপের পরিতর্পণ করিয়া, মানসিংহের দলে মিশিল।

এইরূপে ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতক পাপীর ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ণ কার্য্যের এক অংশ সম্পন্ন হইল। এখন দুর্ব্বৃত্ত উহা অপেক্ষাও আর এক ভয়ঙ্কর অংশ সম্পাদন করিতে হস্ত প্রসারণ করিল। অনন্তসৌন্দর্য্যময় রাজস্থান-কুসুমের জন্য এখনও জয়পুর ও মাড়বারের অধিপতি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী

হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখনও উভয় সৈন্য-দলের আক্রমণে মিবারের পবিত্র ভূমি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত পাঠান এই সময়ে উদয়পুরের রাণার পরামর্শ-দাতা হইয়া উঠিল। তাহার কুপরামর্শে রাণা অপরিস্ফুট হৃদয়রঞ্জন-কুসুমটিকে বৃন্তচ্যুত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যে শান্তিস্থাপন জন্য, তিনি এই উপায়ই প্রশস্ত বোধ করিয়াছিলেন, কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রে এই উপায়েই মিবারের গৌরব রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। অবিলম্বে ঐ সঙ্কল্প সিদ্ধির আয়োজন হইল। মহারাজ দৌলৎ সিংহ রাণার এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। উদয়পুরের সম্মানরক্ষার জন্য ঐ ঘোরতর পাপকার্য্য সাধন করিতে প্রথমে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। প্রস্তাব শুনিয়াই দৌলৎ সিংহ অধীরহৃদয়ে তীব্রস্বরে কহিলেন, "যে জিহ্বা দিয়া এমন কথা বাহির হয়, সে জিহ্বাকে ধিক্, আর যে রাজভক্তি এইরূপে রক্ষিত হয়, সে রাজভক্তিকেও ধিক্।" শেষে রাণার ভ্রাতা যৌবনদাস তরবারি হাতে করিয়া অতুললাবণ্যবতী ষোড়শী বালার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী নিদ্রিত ছিলেন, ঈষদুদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় তাঁহার কোমল দেহের সৌন্দর্য্যছটা শয্যার অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। এ শোভায় ঘাতক স্তম্ভিত হইলেন; ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে তাঁহার হৃদয় অধীর হইল, অবশ হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। ষড়যন্ত্র ক্রমে প্রকাশ পাইল। ক্রমে উহা কৃষ্ণকুমারী ও তদীয় জননীর কাণে গেল। মাতা বিষাদে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না, এ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রেও

ধীরতার সীমা অতিক্রম করিলেন না। তিনি অকাতরে, প্রসন্নমুখে মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিলেন, "মা! ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য ক্ষণস্থায়ী দুঃখে কাতর হইতেছ কেন? আমি কি তোমার কন্যা নই? আমি কেন মৃত্যুকে ভয় করিব? এ অবস্থায় মৃত্যু আমার কাছে পরম সুহৃৎ। ক্ষত্রিয়-বালা আত্ম-সম্মানরক্ষার জন্য আত্ম-প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।" তেজস্বিনী রাজপুত-বালা এইরূপ ধীরভাবে আত্মত্যাগ করিয়া রাজ্যের অমঙ্গল দূর করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। রাণার আদেশে, অনুচর বিষপূর্ণ পাত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণা পিতার আজ্ঞায় অম্লানভাবে তাহা পান করিলেন, আর এক পাত্র আসিল, কৃষ্ণা পূর্ব্বের ন্যায় অম্লানভাবে তাহাও নিঃশেষ করিয়া পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এইরূপে দুইবার বিষপানেও যখন কৃষ্ণার প্রাণবায়ুর অবসান হইল না, দেব-বাঞ্ছনীয়, পবিত্র কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িল না, তখন "কুসুম্ভ-রস" নামে আর এক প্রকার তীব্র হলাহল প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণকুমারী পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লমুখে ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে উহা পান করিলেন। এবার তাঁহার গাঢ় নিদ্রা আসিল; এ গভীর নিদ্রা হইতে তিনি আর জাগরিত হইলেন না। পিতৃ-ভক্তি-পরায়ণা স্বদেশহিতৈষিণী ষোড়শবর্ষীয়া অবলা, অকাতরে অম্লানভাবে আত্মত্যাগের অপার পবিত্রতা বিকাশ করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। ভূলোকে তাঁহার অনন্ত-গৌরবময় কীর্ত্তি-স্তম্ভ অক্ষয় হইয়া রহিল।

দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে এলাহাবাদ হইতে প্রায় এক শত ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে গড়মণ্ডল নামে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। খ্রীঃ ৩৫৮ অব্দে যদুরায় নামক এক জন রাজপুত এই রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। মণ্ডল, সোহাগপুর, ছত্রিশ-গড়, সম্বলপুর প্রভৃতি জনপদ লইয়া গড়রাজ্য সংগঠিত হয়। সোহাগপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত। ঐ স্থানের অধিকাংশ অরণ্যময়। প্রকৃতির অনুকূলতাবশতঃ উহা ধন-সম্পত্তিতে পূর্ণ ছিল। ছত্রিশগড় গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তঃপাতী। পূর্ব্বে উহা রত্নপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ ভূভাগের কিয়দংশ অরণ্য ও পর্ব্বতমালায় সমাবৃত।

গড়মণ্ডলরাজ্য মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। উহার কোথাও জনপূর্ণ পল্লী, সুন্দর জলাশয়, সুরম্য উপবন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকাশ করিয়া দিতেছে, কোথাও স্বচ্ছ-সলিলা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিয়া বৃক্ষসমা-কীর্ণ বন-ভূমির প্রান্তদেশে রজত-মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রফুল্ল কুসুমে সজ্জিত হইয়া, সৌন্দর্য্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছে, কোথাও অটল পর্ব্বত আপ-নার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট পুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোথাও বা প্রস্রবণ-সমূহ সুশীতল, পরি-স্রুত জল দিয়া অরণ্যচর জীবগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। গড়মণ্ডলের রাজধানী প্রসিদ্ধ গড় নগর নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ

তীরে, জব্বলপুরের প্রায় পাঁচ মাইল অন্তরে ছিল। চারি দিক পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত থাকাতে শত্রুপক্ষ সহজে এই নগর আক্রমণ করিতে পারিত না। যবন রাজগণ যখন দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জনপদে আপনাদের ক্ষমতা প্রসারিত করিতেছিলেন, এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য, যখন তাঁহাদের অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকায় শোভিত হইতেছিল, তখন গড়মণ্ডল আপনার স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিল। যবন-ভূপতিগণের সৈন্য-সাগরের প্রবল তরঙ্গ এই রাজ্যের ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গড় নগরের দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও বিস্তার এক মাইল ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর একাংশ অতীত হইয়াছে। সম্রাট্ আকবর শাহ দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, মোগল-শাসন ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের স্বাধীনতা সময়ের অনন্ত স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই দিগ্বিজয়ের সময়ে—যুদ্ধ ও নরশোণিত-প্রবাহের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের সংগঠনকালে, স্বাধীনতার গৌরব-ভূমি মিবার প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের পরাক্রমে শত্রুর সমক্ষে অবিচলিত রহিয়াছিল, আর গড়মণ্ডল প্রাতঃস্মরণীয়া দুর্গাবতীর অসাধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া দুরন্ত শত্রুর সমক্ষে অকাতরে, অম্লানভাবে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল।

খ্রীঃ ১৫৩০ অব্দে যদুরায়ের বংশীয় দলপৎ শা গড়মণ্ডলের অধিপতি হন। এত দিন গড় নগরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল

কিন্তু দলপৎশা সিংহলগড় নামক একটি পার্ব্বত্য দুর্গে আপনার রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে মহবা-রাজ্যে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ আধিপত্য করিতেন। ইহাদের অধিকার এক সময়ে সিংহলগড় ও কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুর্গাবতী উক্ত মহবারাজ্যের একজন ক্ষত্রিয় ভূপতির কন্যা।

দুর্গাবতীর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ তেজস্বিতা ছিল। কথিত আছে, তাঁহার ন্যায় রূপ-লাবণ্যবতী মহিলা তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দলপৎ শা এই সৌন্দর্য্য-শালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দুর্গাবতীর পিতা, দলপৎ শার বংশগৌরবের হীনতার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দলপৎ অতি সুপুরুষ ও অতি তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার দেহ-লক্ষ্মী ও বীরত্বের মহিমায় সমস্ত গড়রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সহিত অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সংযোগ থাকাতে দল-পতের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী চিরকাল তেজস্বিতার পক্ষপাতিনী ছিলেন। এখন গড়মণ্ডলের অধিপতিতে এই তেজস্বিতার সহিত অলোক-সাধারণ সৌন্দর্য্যের সম্মিলন দেখিয়া, তিনি তাঁহার সহিতই পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

দলপৎ রাজপুত-যুবতীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। অবিলম্বে সিংহল গড়ে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দলপৎ ঐ সৈন্য-দল সঙ্গে করিয়া মহবা-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে মহবা-রাজের পরাজয় হইল। দলপৎ

দুর্গাবতীকে লইয়া আপনার রাজধানীতে আসিলেন। বীর-পুরুষ বীরত্বের সমুচিত পুরস্কার পাইলেন। সুন্দর বস্তুর সহিত সুন্দর বস্তুর মিলন হইল, তেজস্বিতা তেজস্বিতাকে আশ্রয় করিল, এক ভাবের দুইটি প্রফুল্ল কুসুম একসূত্রে গ্রথিত হইয়া, গড়মণ্ডলে অনুপম শোভা বিকাশ করিতে লাগিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী তেজস্বী দলপতের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিবাহের চারি বৎসর পরে বীরনারায়ণ নামে একটি পুত্র-সন্তান রাখিয়া, দলপৎ শা লোকান্তরিত হইলেন। এই সময়ে বীরনারায়ণের বয়স তিন বৎসর। বিধবা দুর্গাবতী আপনার শিশু পুত্রের নামে স্বয়ং গড়রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। অধর নামে এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দুর্গাবতী মন্ত্রিবরের পরামর্শ শুনিয়া শাসনকার্য্য চালাইতেন। তাঁহার শাসন-গুণে ক্রমে গড়মণ্ডলের ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জব্বলপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইলেন। দেখাদেখি তাঁহার একটি পরিচারিকাও ঐ জলাশয়ের নিকটে আর একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিল। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। পরিচারিকা দুর্গাবতীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যে সকল লোক বৃহৎ জলাশয় খনন করিতেছে, তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে আপনাদের কাজ শেষ করিবার পূর্ব্বে, নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে এক এক ঝুড়ি মাটি কাটিয়া ফেলিবে। দুর্গাবতী সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশে পরিচারিকার প্রার্থনা অনুসারে কাজ হইতে লাগিল। ক্রমে দুর্গাবতীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জলাশয়ের নিকটে

আর একটি সুন্দর জলাশয় প্রস্তুত হইল। প্রধান অমাত্য অধরও জব্বলপুরের তিন ম্যাইল দূরে একটি বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করাইলেন। মণ্ডলনগরে দুর্গাবতীর একটি হস্তিশালা ছিল। কথিত আছে, সেখানে চৌদ্দ শত হস্তী থাকিত। যাহা হউক, দুর্গাতীর আদেশে গড়রাজ্যে সাধারণের হিতকর নানাবিধ সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। প্রজারা সন্তুষ্ট হইল। তাহারা দুর্গাবতীকে আরাধ্যা মাতা ও রক্ষাকর্ত্রী দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। দুর্গাবতী পনর বৎসর পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিলেন। তাঁহার শাসনগৌরব চারি দিকে বিস্তৃত হইল। গড়মণ্ডলের ইতিহাস অবলার অক্ষয় কীর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মোগল সম্রাট আকবর শাহ অবাধ্য আমীর ও ভূস্বামীদিগকে শাসন করিবার জন্য নানাস্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। আসফ খাঁ নামক এক জন উদ্ধত-স্বভাব সেনাপতি নর্ম্মদার তটবর্ত্তী প্রদেশ শাসনের জন্য প্রেরিত হন। আসফ গড়মণ্ডলের সমৃদ্ধির বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং উহা হস্তগত করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। আকবর শাহ নিজের অধিকার বাড়াইতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সেনাপতিকে গড়রাজ্য অধিকার করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর অধর দিল্লীতে যাইয়া এই আক্রমণ নিবারণের অনেক চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। আসফ খাঁ খ্রীঃ ১৫৬৪ অব্দে ছয় হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও কতকগুলি কামান লইয়া গড়মণ্ডলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অবিলম্বে এই আক্রমণের সংবাদ গড়রাজ্যে প্রচারিত হইল। রাজ্যের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই এই সংবাদে ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর হৃদয়ে কিছুমাত্র ভয়ের আবির্ভাব হইল না। তিনি প্রগাঢ়সাহসসহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে গড়রাজ্যে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র হইল। দুর্গাবতীর পুত্র বীরনারায়ণের বয়স এই সময়ে আঠার বৎসর হইয়াছিল। এই অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবকও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নির্ভয়ে যুদ্ধযাত্রীর দলে মিশিলেন। দুর্গাবতী সৈন্যদিগকে একত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ-বেশে সাজিয়া, মাথায় রাজ-মুকুট, এক হাতে শাণিত শূল ও অপর হাতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া, হস্তীতে উঠিলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় এখন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অটল হইল। দুর্গাবতী অটলভাবে হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গম্ভীরস্বরে সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। বীর-জায়ার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া গড়মণ্ডলের সৈন্যগণ ভয়ঙ্কর শব্দে চারি দিক কাঁপাইয়া তুলিল। তেজস্বিনী দুর্গাবতী বিধর্ম্মী শত্রুকে দেশ হইতে দূর করিবার জন্য ঐ উৎসাহিত সৈন্য দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন।

দুর্গাবতী যখন আট হাজার অশ্বারোহী, দেড় হাজার হস্তী ও বহুসংখ্য পদাতির সহিত সিংহলগড়ের নিকটে শত্রুর সম্মুখে আসিলেন, তখন তাঁহার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে যবন-সৈন্য বিস্মিত হইল, তাহাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভীতি সঞ্চারিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে বাধা দিতে লাগিল। দুর্গাবতী প্রবলপরাক্রমে দুই বার আসফ খাঁর সৈন্য আক্রমণ করিলেন, দুই বারেই

তাঁহার জয়লাভ হইল। শত্রুপক্ষের ছয় শত অশ্বারোহী যুদ্ধে জীবন হারাইল, শেষে অবশিষ্ট সৈন্য রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। দুর্গাবতী দ্বিতীয় বার শত্রু-সেনার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। আসফ খাঁর সৈন্য-দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ভারতের বীররমণীর এইরূপ লোকাতীত পরাক্রমে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতি হতমান হইলেন। যে বীরপুরুষেরা এক সময়ে ভারতের নানাস্থানে জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা আজ ভারতের বীরাঙ্গনার বিক্রমে পরাভূত হইয়া পলাইতে লাগিল। দুর্গাবতী অবিচলিত সাহসের সহিত বিপক্ষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সমস্ত দিন অক্লান্তভাবে শত্রুসৈন্য সন্তাড়িত করিতে লাগিলেন। মোগল-সেনাপতি এ অপূর্ব্ব ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। এই ভয়ঙ্করী মহাশক্তির অপূর্ব্ব শক্তিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল, সাহস দূর হইল এবং তেজস্বিতা পরিম্লান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কোথায় যেন মিশিয়া গেল। আসফ খাঁ চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গড়রাজ্যের পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার এইরূপ অসাধারণ পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল, কামিনীর কমনীয় দেহ এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিল, শত্রু-সেনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। শেষে সূর্য্য অস্তগত হইল দেখিয়া, দুর্গাবতী আপনার সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি দিলেন।

এই বিশ্রাম-সুখই তেজস্বিনী দুর্গাবতীর পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিল। গড়মণ্ডলের সৈন্যগণ সেই সময়ে সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করাতে দুর্গাবতী মনঃক্ষুন্ন হই

লেন। কিছুকাল বিশ্রামের পর, সেই রাত্রিতেই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তাঁহার ইচ্ছামত কাজ হইলে আসফ্ খাঁর সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। কিন্তু বীর-জায়ার এই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সৈন্যগণের সকলেই এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল এবং সকলেই তাঁহাকে বিনয়সহকারে নিশীথে বিপক্ষসৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে নিষেধ করিতে লাগিল। দুর্গাবতী অগত্যা এই প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। এদিকে আসফ খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধে দুইবার পরাজিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। এখন গড়মণ্ডলের সৈন্যগণের বিশ্রামের সংবাদে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কামান লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। প্রভাত হইতে না হইতেই আসফ খাঁ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতীর সৈনিকগণ গড়নগরের ১২ মাইল পূর্ব্বে একটি সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটের নিকটে অবস্থান করিতেছিল। আসফ খাঁ রাত্রি-কালেই তাঁহাদিগকে সেই স্থানে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তখন আসফ খাঁর কামান আসিয়া পহুঁছে নাই। প্রথম আক্রমণে আসফ, দুর্গাবতীর পরাক্রমে পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কামান সকল আসিয়া পহুঁছিলে বিপক্ষেরা আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দুর্গাবতী গিরি-সঙ্কটের প্রবেশ-পথে হস্তীপৃষ্ঠে থাকিয়া ঐ আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অসামান্য সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে তাহারা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। গোলার পর গোলার আঘাতে সকলে কাতর হইয়া পড়িল। কুমার বীর-

নারায়ণ এই সময়ে অসাধারণ বিক্রম দেখাইতে লাগিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ-বয়স্ক তরুণ বীরপুরুষের লোকাতীত পরাক্রম দর্শনে যবনসৈন্য স্তম্ভিতপ্রায় হইল। কিন্তু শেষে বহুসংখ্য শত্রুর আক্রমণে বীরনারায়ণ আহত হইয়া পতনোন্মুখ হইলেন। দুর্গাবতী প্রাণাধিক পুত্রের কাতরতা দর্শনে যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পুত্রকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রমে রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা অসময়ে অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও তিনি কাতর হন নাই। স্নেহের অবলম্ব, প্রীতির পুত্তলী তনয় অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও হতচেতন হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় অধীর হয় নাই। দুর্গাবতী অকাতরে, ধীরভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ ছিল। রাত্রি কালে ঐ নদী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে, উহা জলপূর্ণ হইয়া বৃহৎ স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিল। দুর্গাবতী উহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণ স্রোতস্বতী পার হইয়া, পশ্চাতে যাইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে না। শত্রু-পক্ষের কামানের মুখে থাকিয়াই সৈন্যদিগকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু গোলার আঘাতে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য একে একে বীর-শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। অধিকাংশ সৈন্যের দেহ-রাশিতে সমর-স্থল ভীষণতর হইয়া উঠিল। চারি দিকের যবনসৈন্য উদ্বেল সাগরের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে ক্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিতে লাগিল। তথাপি

তেজস্বিনী দুর্গাবতী ভীত হইলেন না। তিনি কেবল তিন শত মাত্র পদাতি লইয়া ঐ উদ্বেল সৈন্য-সাগরের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি সুতীক্ষ্ণ বাণে হঠাৎ তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। দুর্গাবতী ঐ বাণ বলপূর্ব্বক বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। শর নিঃসারিত না হইয়া চক্ষুকোটরেই রহিল। দুর্গাবতী ইহাতেও কাতর না হইয়া গিরিসঙ্কটরক্ষার জন্য পূর্ব্বের ন্যায় অটলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহার পর আর একটি তীর প্রবলবেগে তাঁহার গ্রীবাদেশে আসিয়া পড়িল। দুর্গাবতী এইরূপ পুনঃপুনঃ শরাঘাতে কাতর হইলেন। চারি দিক তাঁহার নিকট অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি জয়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন। যে অভিপ্রায়ে তিনি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে অভিপ্রায় লক্ষ্য করিয়া মহাবিক্রমে যবনসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, যে অভিপ্রায়ে সমর-স্থলে প্রাণ-প্রিয় পুত্রের শোচনীয় দশাও অকাতরে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সে অভিপ্রায়সিদ্ধির আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু বীররমণী এ অবস্থাতেও ভীরুর ন্যায় যুদ্ধ-ভূমি হইতে পলায়ন করিলেন না, ভীরুর ন্যায় বীর-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া শত্রুর পদানত হইলেন না। তাঁহার হস্তীচালক পশ্চাতের নদী পার হইয়া যাইতে তাঁহার নিকটে বারংবার অনুমতি চাহিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গাবতী তাহাতে সম্মত হইলেন না। বীরাঙ্গনা বীর-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমর-ক্ষেত্রেই দেহপাত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন আহত স্থান হইতে অনর্গল শোণিত

ধারা বাহির হইয়া তাঁহার দেহ প্লাবিত করিল, শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, তেজ ক্ষীণতর হইয়া পড়িল, তখন তিনি অম্লানবদনে হস্তীচালকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিলেন এবং অম্লানবদনে উহা স্বীয় দেহে প্রবেশিত করিয়া রুধিরে রঞ্জিত করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ বিচেতন ও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। ছয় জন সৈনিক পুরুষ দুর্গাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা এই অসমসাহসের কার্য্য দর্শনে জীবনের আশা ছাড়িয়া শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

যে স্থানে দুর্গাবতী প্রাণ ত্যাগ করেন, পথিকগণ আজ পর্য্যন্ত পথ অতিবাহনসময়ে সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উহা একটি সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট। উহার নিকটে দুইটি অতি প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, দুর্গাবতীর রণডঙ্কা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ গিরিসঙ্কটের সহিত প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব থাকাতে উহা একটি দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ গম্ভীর স্থানের গম্ভীর দৃশ্য দেখিলে মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে।

যুদ্ধের সময়ে দুর্গাবতীর লোকে আহত বীরনারায়ণকে শত্রুর অজ্ঞাতসারে চৌরগড় নামক দুর্গে আনিয়াছিল। আসফ খাঁ শেষে ঐ দুর্গও আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে বীরনারায়ণ নিহত হইলেন। এদিকে দুর্গস্থিত মহিলাগণ বিধর্ম্মী শত্রুর হস্তে আত্ম-সম্মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়

আবাস-গৃহে আগুন লাগাইয়া দিল। আসফ খাঁ দুর্গ জয় করিলেন, কিন্তু কামিনী-কুলের ধর্ম্ম জয় করিতে পারিলেন না। বিকশিত কুসুমদল পর-হস্তের অপবিত্র সংযোগে পরিম্লান হইল না। রমণীগণ জ্বলন্ত অনল-শিখায় অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনাদের অপার পবিত্রতার গৌরব রক্ষা করিল।

মোগলসৈন্য গড়নগর লুণ্ঠন করিয়া অনেক অর্থ পাইয়াছিল। আসফ খাঁ বিশ্বাসঘাতক হইয়া অনেক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কথিত আছে, তিনি দুর্গাবতীর ধনাগারে একশতটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সূতগণ দুর্গাবতীর বীরত্বকাহিনী গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া বীণাসংযোগে নানা স্থানে গাইয়া বেড়ায়। কালের কঠোর আক্রমণে গড়রাজ্য এখন পূর্ব্ব-গৌরব-ভ্রষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তেজস্বিনী দুর্গাবতীর গৌরব কখনও বিলুপ্ত হইবে না। যত দিন স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যত দিন অসাধারণ বীরত্ব বীরেন্দ্র-সমাজের একমাত্র পবিত্র সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, যত দিন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মধুর বাক্য স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তির কোমল হৃদয়ে অমৃত-প্রবাহের সঞ্চার করিবে এবং যত দিন আত্মাদর ও আত্মসম্মান পাপ ও কুপ্রবৃত্তির মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া অটল গিরিবরের ন্যায় উন্নত থাকিবে, তত দিন দুর্গাবতীর পবিত্র কীর্ত্তির বিলয় হইবে না।
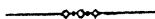
কুমার সিংহ।

চতুর্থ খণ্ড।

আর্য্যকীর্ত্তি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৬।

সূচী।
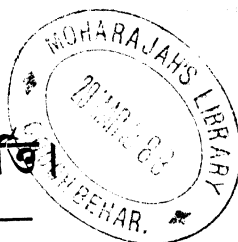
আর্য্যকীর্ত্তি।

ভারতে ভারতীর অপূর্ব্ব পূজা।

খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। অপূর্ব্ব উৎসব, বিপুল সম্পত্তি লইয়া, সপ্তম শতাব্দী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এ সময়ে ভারতের এখনকার ন্যায় মলিন বেশ নাই, দীনতা হীনতার আবেশ নাই, শোকের উচ্ছ্বাস, নিরাশার আর্ত্তনাদ, মহামারীর করাল ছায়া, কিছুই নাই। এসময়ে ভারত প্রফুল্ল, স্বাধীনতার বলে বলীয়ান্, ধন-সম্পত্তির মহিমায় গৌরবান্বিত। এ সময়ে আর্য্য-কীর্ত্তি পূর্ণতা পাইয়াছে। আর্য্য-সভ্যতায় জগতে অতুল্য দর্শন-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মনোহর কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা-বিদ্যার গৌরব বাড়িয়াছে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের শাসন-মহিমায় ভারতভূমি বিপুল সম্পত্তি-শালিনী হইয়াছেন। মহারাষ্ট্র-রাজ মহাবীর পুলকেশের বীরত্বে ভারতের বীরত্ব-কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। আর নালন্দায় ভারতীর অপূর্ব্ব পূজায় ভারতের গৌরব দিক্‌দিগন্তে দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নালন্দায় বেদমাতা ভারতীর এই পূজা ভারতের একটি প্রধান কীর্ত্তি। নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্ত্তমান বড়গাওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা

হউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটি আম্র কানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক্ উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ ঐ আম্রকাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্ম-পরায়ণ বৌদ্ধ ভূপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে এই বিদ্যা-মন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার বিদ্যামন্দির এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এইখানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা-বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষ-বাটিকায় এই মহাবিদ্যালয় পরিশোভিত ছিল। ছয়টি চারিতল অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য একশতটি গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পারসম্মিলনের জন্য মধ্য স্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল ঐ স্থানের শান্তিভঙ্গ করিত না। সাংসারিক প্রলোভন উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ ঐ পবিত্র শান্তি-নিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্র-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয় কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও

উহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং উহার শিক্ষার্থিগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যা-মন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই ইঁহার আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্মপরতায়, অসাধারণ দূরদর্শিতায় ও অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার পবিত্র বিদ্যালয় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

চীনের প্রসিদ্ধ পর্য্যটক হিউএন্ থ্সঙ্গ্ এই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতীর ঐ লীলাভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হন্। হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বিনয়ের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক নালন্দায় আসিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশসময়ে দুই শত জ্ঞান-বৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথোচিত অভ্যর্থনা-সহকারে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ, কেহ ছাতা ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসাগীতি গাহিয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন, হিউএন্ থ্সঙ্গ্ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, বিনয়নম্রতার সহিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউএন্ থ্সঙ্গ্ শীলভদ্রের শিষ্য-শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। যিনি চীন

সাম্রাজ্যে সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিৎ বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণে যাঁহার লোকাতীত জ্ঞান গরিমার নিকটে অবনত-মস্তক হইত, তিনি আজ জ্ঞান-সঞ্চয় মানসে ভারতীয় এই পবিত্র লীলা-ভূমিতে ভারতের এই অভিজ্ঞ পুরুষের শিষ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের একটি উৎকৃষ্ট গৃহে হিউএন্ থ্‌সঙ্গকে স্থান দেওয়া হইল। দশ জন লোক তাঁহার অনুচর ও দুইজন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত হইলেন। মহারাজ শিলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। হিউএন্ থ্‌সঙ্গ সকলের আদরণীয় হইয়া পাঁচ বৎসর নালন্দার বিদ্যালয়ে রহিলেন। পাঁচ বৎসর মহাপ্রজ্ঞ শীলভদ্রের পাদ-মূলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণদিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। এখন এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই। কালের কঠোর আক্রমণে, বিদেশীয় আধিপত্য-প্রভাবে ভারতীয় এই লীলা-ভূমি এখন ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

সীতারাম রায়।

যখন সম্রাট ফর্‌রোখ্‌শের দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মহামতি নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গুরুগোবিন্দের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া, যখন ধীরে ধীরে আপ-

নাদের মহাপ্রাণতার পরিচয় দিতেছিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন মহাবীর শিবজীর প্রদত্ত শিক্ষাবলে, অসীম সাহস ও অসাধারণ তেজস্বিতার সহিত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিল, তখন বাঙ্গালার যশোহর জেলা, সুরম্য জলাশয় সুদৃশ্য অট্টালিকা ও সুদৃঢ় দুর্গে পরিবৃত হইয়া, ভারতের সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে আপনার গৌরব ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর পরিচয় দিতেছিল। ঐ জেলায় মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে মহম্মদপুর নামে একটি বিস্তৃত নগর ছিল। নগর একটি প্রকাণ্ড দুর্গে পরিবেষ্টিত। দুর্গের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর—প্রাচীরের চতুঃপার্শ্বে গড়খাই করা। এই দুর্গে একদা রাত্রিকালে একটি সুগঠিত, পূর্ণ-যৌবন-প্রাপ্ত পুরুষ নিবিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। যুবকের মূর্ত্তি গম্ভীর, প্রশান্ত, অথচ বীরত্ব-ব্যঞ্জক। যুবক অনন্যমনে, অনন্যসাধারণ পারদর্শিতার সহিত সতরঞ্চের গুটিকা চালনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, নবাবের বহুসংখ্যক সৈন্য দুর্গের অভিমুখে আসিতেছে, তাহারা শীঘ্রই দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিবে। যুবক কিছু অন্যমনস্ক হইলেন, তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত হইল, ললাট রেখা ঈষৎ বিকাশ পাইয়া প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের ব্যতিক্রম ঘটাইল; যুবক কিছু অস্থির হইলেন বটে, কিন্তু খেলা হইতে বিরত হইলেন না, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্য, আবার বিশেষ বিবেচনার সহিত গুটিকা চালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত হইলেন না। কিঞ্চিৎ অস্থিরতাপ্রযুক্ত যুবক সে বাজি হারিলেন। তখন তিনি বড় বিরক্ত হইয়া কহিলেন :—

"আজ যে কষ্ট পাইলাম, যবনের মাথা কাটিলেও সে কষ্ট যাইবার নহে।"

নিকটে একটি দীর্ঘকায়, ভীম-পরাক্রম বীরপুরুষ দণ্ডায়মান ছিল। যুবকের কথা শুনিয়া, সে নিঃশব্দে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

রজনী প্রভাত হইল, নবীন সূর্য্য নবীনভাবে উৎফুল্ল হইয়া, মহমুদপুরের দুর্গ উদ্ভাসিত করিল। যে যুবক গত রাত্রিতে সতরঞ্চ খেলিয়াছিলেন, প্রভাতে তিনি মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই দীর্ঘকায় বীরপুরুষ তাঁহার পাদতলে একটি ছিন্ন মস্তক রাখিয়া অভিবাদন করিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে যুবক চমকিত হইলেন। অসময়ে, অতর্কিতভাবে মনুষ্যের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বীরপুরুষকে কহিলেনঃ—

"মেনাহাতী! এ কি?"

মেনাহাতী অবনতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলঃ—

"মহারাজ! যবন সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। ইহা মুসলমান সেনাপতি আবুতরাবের মস্তক।"

যুবকের জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় হইল, গম্ভীর, প্রশান্ত মুখমণ্ডল অধিকতর গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন বিকাশ করিতে লাগিল। যুবক কিছু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু সে চিন্তার আবেগ বাহিরে পরিস্ফুট হইল না। যুবক প্রফুল্লচিত্তে মেনাহাতীকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে এইরূপ সাহস ও পরাক্রমের জন্য, তাহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া, কহিলেন "নবাবের সহিত বোধ হয়, শীঘ্র তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত

হইবে। যাহা হউক, ভয়ের কোন কারণ নাই। তুমি সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাক।”

পূর্ণ-যৌবন-প্রাপ্ত এই তেজস্বী পুরুষের নাম সীতারাম রায়। আর এই অতুল বীরত্ব-শালী ভীম-পরাক্রম বীর পুরুষ, তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতী।

সীতারাম রায় উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। মধুমতী নদীর পূর্ব্ব-তীরে হরিহরনগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সীতারাম রায়ের জন্ম হয়। সীতারামের পিতার যৎসামান্য ভূ-সম্পত্তি ছিল। যাহাহউক, সীতারাম তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পাঠশালায় তিনি প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। নিস্তেজ, নিরীহ পণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা, সাহসী, তেজস্বী বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে, তাঁহার অধিকতর ইচ্ছা ছিল। মহারাষ্ট্রের উদ্ধারকর্ত্তা শিবজী, বাল্যকালে অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, সকলকে চমকিত করিয়াছিলেন, পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ শৈশবে লোকাতীত শূরত্বের বলে, পঞ্জাবের গৌরবসূর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সীতারাম রায় আপনার বীরত্ব ও সাহসের প্রভাবে, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যত হইলেন।

সীতারাম অল্পবয়সে তীর-সঞ্চালনে সুদক্ষ হইলেন, লাঠিখেলায় প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, অশ্বারোহণে অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিতে লাগিলেন, বন্দুক ধরিতে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিলেন এবং অসিচালনায় সমস্ত

বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি যেরূপে চক্ষুর নিমিষে লক্ষ্য পাতিত করিতেন, যেরূপ দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতেন, যেরূপে নিষ্কোষিত অসি ও সুদৃঢ় লাঠি লইয়া অসাধারণ চালনা-কৌশল দেখাইতেন, তাহা সেসময়ে বাঙ্গালার নবাবের ও দিল্লীর সম্রাটের অমাত্যগণ বিস্ময় ও ভীতির সহিত শুনিতেন। বাঙ্গালী এখন সাধারণের নিকটে ভীরু বলিয়া বিকৃত হইতেছে, বাঙ্গালা এখন কতিপয় অনভিজ্ঞ বিদেশীর লিখিত ইতিহাসে, অকর্ম্মণ্য সন্তানের প্রসূতি বলিয়া অবিরত কুৎসা সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও এরূপ কলঙ্কের কালিমায় মলিন হয় নাই। অনেক দোষে বাঙ্গালার অধঃপতন হইয়াছে, অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী মনস্বিতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। যখন দিল্লীর মুসলমান সম্রাটগণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন, দেশের পর দেশ যখন তাঁহাদের পদানত হইতে থাকে, তখনও বাঙ্গালী অনেক স্থানে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেন। বাঙ্গালার বিজয়সিংহ দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন, বাঙ্গালার গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যার আধিপত্য স্থাপন করিয়া, পবিত্র ইতিহাসের নিকটে বীরত্ব ও সাহসের পূজা পাইয়াছেন, বাঙ্গালার পাল ও সেনরাজারা বিজয়িনী সেনার অধিনায়ক হইয়া, বিজয়-মহিমায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিক আপনাদের শূরত্ব ও বীরত্বে দিল্লীর সম্রাটকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছেন, আর বাঙ্গালার সীতারাম ক্ষমতা ও তেজস্বিতায় বীরেন্দ্র সমা-

জ্ঞের বরণীয় হইয়া উঠেন। বাঙ্গালার বীর্য্যবন্ত পুরুষ-সিংহেরা যথানিয়মে রণকৌশল শিক্ষা করিতেন এবং প্রশস্ত ক্রীড়া-ভূমিতে কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া, দর্শকদিগকে সম্প্রীত করিতে ব্যস্ত থাকিতেন; বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। যতদিন পবিত্র ইতিহাসের মর্য্যাদা থাকিবে, যত দিন দেশহিতৈষিতার সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিবে, যত দিন পূর্ব্বস্মৃতি সমবেদনার প্রাধান্য রাখিতে প্রয়াস পাইবে, ততদিন সত্যনিষ্ঠ সহৃদয়গণ মুক্তকণ্ঠে, জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিবেন, বাঙ্গালা পূর্ব্বে কখনও আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই।

বয়োবৃদ্ধির সহিত সীতারাম রায় অনেক বীরপুরুষের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে অনেক ভূ-সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। মহমুদপুরের পূর্ব্বে বরাসিয়া নদীর তটে ভূষণা নামে একটি জনপদ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। সীতারাম উহার সত্বাধিকারী হইলেন। ক্রমে মহমুদপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। সীতারাম আপনার ভুজবলে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই কথা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি দুর্দ্দান্ত দুরাচার ব্যক্তির নিকটে কর গ্রহণ করিয়া, পর-পীড়িত, পর-পদানত দুঃখীর উপকার করিতেন। যেখানে নিঃসহায়, নিঃসম্বল ব্যক্তির কষ্ট দেখিতেন, সেই খানেই সীতারাম তাহার কষ্টমোচনে উদ্যত হইতেন। এই সময়ে যশোহরে দ্বাদশ চাকলা ছিল। ঐ চাকলার অধিস্বামিগণ দিল্লীর সম্রাটকে রীতিমত রাজস্ব দিতেন না। সম্রাট ফররোখ্‌শের বীর-শ্রেষ্ঠ সীতারামের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই ঐ সকল অবাধ্য ভূস্বামীদিগের

দমন জন্য অনুরোধ করিলেন। বাদশাহের অনুরোধ পত্র পাইয়া সীতারাম সকল ভূস্বামীকে আপনার অধীন করিয়া দ্বাদশ চাকলার অধিপতি হইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন। তেজস্বী সীতারামকে "রাজ" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। বিষয় বৈভব-হীন সামান্য লোকের সন্তান আপনার ক্ষমতা-বলে "রাজা" হইলেন। তাঁহার গৃহ ধন-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি আপনার পরোপকার-ব্রত হইতে স্খলিত হইলেন না। রাজা সীতারাম রায় পূর্ব্বের ন্যায় দুঃখীর দুঃখ মোচনে, বিপন্নের বিপদ নিবারণে, অসহায়ের সাহায্য করণে, নিঃসম্বলের সম্বলদানে ব্যাপৃত রহিলেন।

সীতারাম রাজা হইলে, বাঙ্গালার নবাব তাঁহার নিকট রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সীতারাম রায় নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেননা এবং নবাবের কাছে কোনও প্রকার অবনত হইলেন না। তিনি তেজস্বিতার সহিত নবাবকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি নবাবের প্রজা নহি। আমার কাছে রাজস্ব প্রার্থনা করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি যশোহরের স্বাধীন রাজা। নবাব ক্রুদ্ধ হইলেন। সীতারামের শাসন জন্য অনেকবার সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা। সীতারামের বীরত্বে সীতারামের সাহসে, অধিকন্তু তদীয় মুসলমান সেনাপতি মেনাহাতির অপূর্ব্ব কৌশলে, নবাবের সৈন্য বারংবার পরাজিত হইল বাঙ্গালার বীরপুরুষ, স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিলেন এবং প্রকৃত বীরত্ব দেখাইয়া নবাবকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন।

নবাব অতঃপর বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত আপনার জামাতা আবুতরাবকে সীতারামের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। আবুতরাব

রাত্রিকালে সীতারামের মহমূদপুর দুর্গের নিকটে উপনীত হন। এই সময়ে সীতারাম সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। খেলায় হারি হওয়াতে রাজা সীতারাম রায় বিরক্ত হইয়া, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া প্রভুভক্ত মেনাহাতী প্রভুর কথা সার্থক করিবার জন্য, সেই রাত্রিতেই আবুতরাবকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে তদীয় ছিন্ন মস্তক সীতারামের কাছে আনিয়া দেন। ঐ মস্তক দেখিয়াই, রাজা সীতারাম রায় সাহসী সেনাপতিকে পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং নবাবের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া মেনাহাতীকে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে কহিয়াছিলেন।

জামাতার মৃত্যুসংবাদ নবাবের কাছে পহুঁছিল। নবাব সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, আর এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। এই সৈন্যদলের অধিনায়ক সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত না হইয়া, সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীকে কৌশলক্রমে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা সফল হইল। বিপক্ষেরা কৌশলক্রমে নিরস্ত্র মেনাহাতীকে ধরিয়া লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিল। ঐ ঘটনার সপ্তাহকাল পরে শত্রুর হস্তে মেনাহাতী নিহত হইলেন। রাজা সীতারাম রায় প্রভুভক্ত সেনাপতির মৃত্যুতে বড় কাতর হইলেন। সংসারের সকল বিষয়ে তাঁহার বিরাগ জন্মিল। তিনি আর যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া, শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। নবাবের সেনাপতি তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া দরবারে লইয়া যাইতেছিলেন, পথে আপনার অঙ্গুরীয়স্থ হীরকলেহনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। পূর্ণযৌবনে পুরুষ-সিংহ আপনার ইচ্ছায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাজা সীতারাম রায় যশোহরে অনেকগুলি বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়াছেন; দেবতার উদ্দেশে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া আপনার অচলা দেব-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহম্মদপুরের দুর্গ তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি চিহ্ন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণসাগর আজ পর্য্যন্ত যশোহর জেলায় সর্ব্বপ্রধান জলাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এখনও রাজা সীতারাম রায়ের অনেক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অনন্ত কালের অপার শক্তির পরিচয় দিতেছে। ফলে সীতারামের শাসনে যশোহর বিশেষ সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে ইদানীন্তন মহানগরী কলিকাতা ব্যাঘ্রাদিহিংস্রপশু-পূর্ণ জঙ্গলে পরিবৃত ছিল এবং ঐ সময়ে ইদানীন্তন বাঙ্গালার হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা শ্বেতপুরুষগণ বাঙ্গালায় সামান্য বণিকের বেশে ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

কুমার সিংহ।

বাঙ্গালার নবাবের অধিকারে ব্রিটিশ কোম্পানির অভ্যুদয়সময়ে অন্ধকূপ-হত্যার বিবরণ বড় আতঙ্কজনক। ঐ সময়ে প্রচণ্ড জ্যৈষ্ঠের নিদারুণ নিশীথে ১২৩ জন ইঙ্গরেজ একটি গবাক্ষ-শূন্য ক্ষুদ্র গৃহে বায়ুর অভাবে, জলের অভাবে চির নিদ্রায় অভিভূত হন। উহার ঠিক এক শত বৎসর পরে আর একটি বিশ্বত্রাস তরঙ্গের আঘাতে ভারতবর্ষ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। ঐ তরঙ্গের আন্দোলন অন্ধকূপ-

হত্যা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। অন্ধকূপের ঘটনায় ভারতবর্ষের কেবল একটি ক্ষুদ্রতর অংশেই নৈরাশ্য, বিষাদ ও আতঙ্কের তরঙ্গ নাচিয়া বেড়াইয়াছিল, কিন্তু ঐ সর্ব্বব্যাপী তরঙ্গ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপিয়া সকলকেই গভীরতম আশঙ্কার সাগরে ডুবাইয়া ফেলে। অন্ধকূপের ঘটনার সময়ে ভারতে ব্রিটিশ প্রতাপ বদ্ধমূল ছিল না, ব্রিটিশগণ তখন সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল। কিন্তু ঐ তরঙ্গের রঙ্গ-সময়ে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দূরতর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, সমগ্র ভূখণ্ডে ব্রিটিশ প্রতাপ বিস্তৃত হইয়াছিল। সিন্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সমৃদ্ধস্থলে ব্রিটিশ-পতাকা উড়িতেছিল এবং ইঙ্গ্‌লণ্ডের বণিক-সমিতির একজন অনুগত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা, অশোক ও বিক্রমাদিত্য অথবা পিতর বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজমহিমার স্পর্দ্ধা করিতেছিল।

১৮৫৭ অব্দে যখন ভারতবর্ষে ঐ ভীষণ বিপ্লবের আবির্ভাব হয়, সিপাহিগণ যখন রণ-রঙ্গে অধীর হইয়া আপনাদের লোকাতীত সাহসের পরিচয় দিতে থাকে, বাঙ্গালা হইতে অযোধ্যা, দিল্লী হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত, সমুদয় স্থল যখন নর-শোণিত-স্রোতে-রঞ্জিত হইয়া উঠে, মৃত্যুর করাল-ছায়া, নিরাশা ও বিষাদের ঘোর অন্ধকার যখন একটি বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধ ভূখণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন বিহারের একটি বর্ষীয়ান বীরপুরুষ আপনার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন, আত্মসম্মান, আত্ম-মর্য্যাদার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে জীবনের শেষ অবস্থায় অনুপম শূরত্ব ও তেজস্বিতা দেখাইয়া সকলকে চমকিত

করিয়া তুলেন। এই তেজস্বী বর্ষীয়ান বীরপুরুষের নাম, কুমারসিংহ।

কুমার সিংহ আরা জেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের মহাসম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। ডুমরাওঁ রাজবংশের সহিত ইঁহার সম্বন্ধ ছিল। অনেকের মতে সিপাহি-যুদ্ধের সময় কুমার সিংহ অশীতি বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, আবার কাহারও কাহারও মতে, ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হয় নাই। যাহা হউক ১৮৫৭ অব্দের ঘোর বিপ্লবের সময়ে কুমারসিংহ যে, অশীতিপরবৃদ্ধ ছিলেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত মত অনুসারে ১৭৭৭-৭৮ অব্দে কুমার সিংহের জন্ম হয়।

কুমার সিংহের বাল্যাবস্থার বিবরণ স্পষ্টরূপে জানা যায় না। যে দেশে জীবন-চরিত লেখার প্রথা নাই, মহৎ জীবনের ঘটনাবলী জগতের সমক্ষে প্রচার করিবার পদ্ধতি নাই, কুমারিল বা সায়নাচার্য্য, বিজয়সিংহ বা গোবিন্দ সিংহের ন্যায় আর্য্য পুরুষ-প্রধানেরা যে দেশে কল্পনাময় পদার্থের ন্যায় লোকের মানসক্ষেত্রে নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইয়া থাকেন, সে দেশে কুমার সিংহের বাল্যজীবন জানা বড় সহজ নহে। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, কুমার সিংহ কেবল বই পড়িয়া কালকর্ত্তন করা অপেক্ষা, সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিতেই অধিক ভাল বাসিতেন। সুতরাং তাঁহার বাল্যজীবন গুরুসন্নিধানে অতিবাহিত হয় নাই, সংযমী গুরুর মুখে শম-দমের গুণ-গরিমার কথা শুনিয়া, তিনি আপনাকে শান্ত, দান্ত, নির্জ্জীব ও নিরীহ করিতে প্রয়াস পান

নাই। তিনি লেখাপড়া অপেক্ষা প্রকৃত রাজপুতের ন্যায় তেজস্বিতা, বীরত্ব ও সাহসশিক্ষাতে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। প্রতাপ সিংহ যেমন সাহসী অনুচরগণের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া আপনার লোকাতীত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, গোবিন্দ সিংহ যেমন তরুণবয়সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপনার ভবিষ্য কীর্ত্তির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, ফুলাসিংহ যেমন আসাধারণ তেজস্বিতা দেখাইয়া, শেষে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কুমার সিংহও তেমনি নবীন বয়সেই আপনার তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। অস্ত্রশিক্ষা করা তাঁহার একটি প্রধান আমোদ ছিল। বাস-স্থানের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে তিনি প্রায়ই মৃগয়ায় মত্ত থাকিতেন। পুরুষ-সিংহ শের শাহ যেখানে আপনার অতুল বীরত্বের পরিচয় দেন, হুমায়ুনের বিজেতা, দিল্লীর ভবিষ্য সম্রাট্, যেখানে বিজয়লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া, বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হন, কথিত আছে, কুমার সিংহ সেই রোটস্ দুর্গের পার্ব্বত্য প্রদেশে সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতেন। সর্ব্বদা এইরূপ দুর্গম স্থানে যাতায়াত করাতে ও মধ্যে মধ্যে এইরূপ কষ্টসাধ্য মৃগয়া-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে কুমার সিংহ, ক্রমে সাহসী, তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। রাজপুতযুবক ক্রমে আপনার পূর্ব্বপুরুষোচিত বীরত্বগুণে ভূষিত হইয়া সমস্ত বিহারে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

ডুমরাওঁর রাজা বহুকাল হইতে শাহাবাদের উজ্জয়িনী ক্ষত্রিয়দিগের অধিনেতা ছিলেন। শেষে ঐ ক্ষত্রিয়গণ দুই

দলে বিভক্ত হয়। সিপাহি বিপ্লবের সময়ে বাবু কুমার সিংহ উহার একদলের অধিনায়ক ছিলেন। ডুমরাওঁর ভূপতি অপর দলের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। আপনার দলস্থ ক্ষত্রিয়গণই কুমার সিংহের প্রধান সৈন্য ছিল। সাহসে ও তেজস্বিতায় ইহারা শাহাবাদের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুমার সিংহ আপনার দলের সকলকেই নিষ্কর ভূমি দিতেন। গরিব দুঃখীও তাঁহার নিকটে উপেক্ষিত হইত না। কথিত আছে, এইরূপে অনেক নিষ্কর ভূমি দেওয়াতেই তিনি শেষে ঋণগ্রস্ত হন। ক্রমে তাঁহাকে মোকদ্দমা-জালে জড়িত হইতে হয়। শাহাবাদের কলেক্টরের নিকটে ক্রমাগত ঐ সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে। শেষে কুমার সিংহ অনেক টাকার জন্য দায়ী হইলেন। তিনি এক জনের নিকট হইতে কুড়ি লক্ষ টাকা লইয়া ঋণ পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু এই টাকা আসিয়া পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইহার মধ্যে ঘটনা-ক্রমে আর এক জনের নিকট হইতে কিছু টাকা পাওয়া গেল। কুমার সিংহ এই টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকার একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, রেবিনিউ বোর্ড ঋণ-পরিশোধের জন্য তাঁহাকে কিছু অধিক সময় দিবেন, কিছু অধিক সময় পাইয়া, তিনি সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন। কুমার সিংহ এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, এইরূপে সমস্ত বিষয়েরই সুবন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বা সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। অবিলম্বে অতর্কিত-ভাবে রেবিনিউ বোর্ড তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। কুমার সিংহ যখন টাকাসংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, তখন

রেবিনিউ বোর্ড পাটনার কমিশনরদ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, "যদি এক মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বোর্ড গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার জমিদারীর সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিবেন, গবর্ণমেণ্ট আর তাঁহার জমীদারীসংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইবেন না।" কুমার সিংহ দুঃখিত হইলেন। এক মাসের মধ্যে সমস্ত টাকাসংগ্রহের কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং বোর্ডের আদেশে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইল। তিনি গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, সময়ে সময়ে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক উপকার পাইবেন। কিন্তু বোর্ডের মহিমায়, পরিণামে সে আশা নির্ম্মূল হইল। তেজস্বী রাজপুত বীর দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিতা বিলুপ্ত হইল না। এ ক্ষতি, এ বিরাগ, এ অপমানের কথা, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে অক্ষয় অক্ষরে লেখা রহিল।

কুমার সিংহ ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন না। তিনি অকারণে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া আপনার উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় দিতেন না। ক্ষত্রিয় বীর যথানিয়মে প্রকৃত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। কথিত আছে, কুমার সিংহ খাজানা আদায়ের জন্য, প্রায় কোন প্রজার উপর পীড়াপীড়ি করিতেন না। প্রজারা সন্তুষ্ট চিত্তে যাহা দিত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন। তাঁহার অধিকারে যদি কাহারও কোন বিষয়ে অধিক লাভ হইত, তাহা হইলে কুমার সিংহ স্বয়ং তাহার লাভের অংশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেন, ব্যবসায়ীও সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার

অভিলায পূর্ণ করিত। কিন্তু তিনি উৎপীড়ন করিয়া কোন ব্যবসায়ী বা কোন প্রজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। কুমার সিংহের উপাধি 'বাবু'ছিল। এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে বাবু কুমার সিংহ নামে অভিহিত হইতেন। সমস্ত শাহাবাদ জেলা বাবু কুমার সিংহের প্রতিপত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, সমস্ত শাহাবাদ জেলার লোক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত বাবু কুমার সিংহের নাম গাইয়া বেড়াইত। রেবিনিউ বোর্ডের বিচারে বাবু কুমার সিংহের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। কুমার সিংহ যদিও ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, দুঃসহ দুঃখের গভীর আবেগ যদিও তাঁহার হৃদয়ে প্রসারিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি সহসা গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে সমুত্থিত হন নাই, গভীর আবেগে পরিচালিত হইয়া, সহসা আপনার অধীরতা প্রদর্শন করেন নাই, সহসা কোম্পানির রাজত্বের উচ্ছেদ করার স্বপ্নে মোহিত হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক সমর-ভূমিতে অবতীর্ণ হন নাই। তাঁহার হৃদয় যেমন প্রশস্ত ছিল, সাধুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বভাবের পবিত্রতাও সেইরূপ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুরুষেরা তাঁহার উন্নত প্রকৃতির সমাদর করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। সিপাহি যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কুমার সিংহ গবর্ণমেণ্টের অনুরাগভাজন ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দের ১৪ই জুন পাটনার কমিশনর টেলর সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখেন, 'অনেকে আমার নিকট, কতিপয় জমীদার, বিশেষ বাবু কুমার সিংহের রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া পত্র পাঠাইতেছে। কিন্তু কুমার সিংহের সহিত আমার যেরূপ সৌহার্দ্দ আছে,

গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমি ঐ কথার সমর্থন করিতে পারিতেছি না।” ইহার পর ৮ই জুলাই কমিশনর উল্লেখ করেন, “বাবু কুমার সিংহ সাধ্যানুসারে সকলই করিতে পারেন। কিন্তু এখন তাঁহার কোনরূপ অবলম্বন নাই। তিনি অনেক বার আপনার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া, আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন।” শাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটও পাটনার কমিশনরের সহিত এবিষয়ে একমত হইতে বিমুখ হন নাই। কুমার সিংহের উপর প্রগাঢ় আস্থা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখাইয়া, মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টে লিখেন, “উপস্থিত গোলযোগের সূত্রপাত হইতেই বাবু কুমার সিংহের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি উহাতে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। কমিশনর তাঁহার রাজভক্তির সম্বন্ধে সাতিশয় সন্তোষ-জনক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।”

কুমার সিংহের রাজভক্তি এইরূপ উচ্চতর ছিল। উচ্চতর রাজভক্তির গুণে তিনি সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে এইরূপ সম্মানিত হইতেন। যদি রাজপুরুষেরা হৃদয়ের সরলতা দেখাইতেন, সর্ব্বদা ধীরভাবে বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া যদি সদ্ব্যবহার দ্বারা এই বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীরকে সন্তুষ্ট রাখিতেন, তাহা হইলে সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস বোধ হয় রূপান্তর পরিগ্রহ করিত, বোধ হয় কুমার সিংহ জীবনের শেষ দশায় অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত রণরঙ্গে মাতিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিপদে ফেলিতেন না। কিন্তু ঘটনা-স্রোত অন্য দিকে

ধাবিত হইল। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের অদূরদর্শিতা, অপরিণাম-বুদ্ধিতে তেজস্বী রাজপুতের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, শাহাবাদের ইতিহাস শোণিতাক্ষরে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল।

যখন সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, গ্রামের পর গ্রাম যখন উচ্ছৃঙ্খল ও উৎসন্ন হইতে থাকে, নগরের পর নগরে যখন ভীষণ শোণিত-তরঙ্গিণী অপূর্ব্ব তরঙ্গ-লীলা দেখাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলে, তখন রাজ-পুরুষেরা সকল দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত যদি ধীরতা ও পরিণামদর্শিতার সংযোগ থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বস্ত লোকেরা সহসা অবিশ্বস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। গবর্ণমেণ্টও বিপদের পর বিপদে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন না। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর গোলযোগের সময়ে এরূপ ধীরতা বা এরূপ পরিণাম-দর্শিতার সম্মান রক্ষা পায় নাই। সে সময়ে যাহার কিছু ক্ষমতা ছিল, যে সাধারণের সমক্ষে কিয়ৎপরিমাণে আপনার প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, সে পূর্ব্বাবধি বিশ্বস্ত থাকিলেও রাজপুরুষেরা সহসা তাহার প্রতি অনুচিত সন্দেহ করিতে আরম্ভ করেন। বিশ্বাস ও ভালবাসা যাহাকে ঐ দুঃসময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু করিতে পারিত, অবিশ্বাস ও সন্দেহ তাহাকে বিরক্ত ও পরম শত্রু করিয়া তুলে। সমস্ত শাহাবাদে কুমারসিংহের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল; প্রবীণতা ও তেজোমহিমার গুণে কুমার সিংহ সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে এই তেজস্বী রাজপুতের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা

প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু পাটনার কমিশনর প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি কুমার সিংহের বিশ্বস্ততা ও প্রভু-ভক্তির সম্বন্ধে যেরূপ সন্তোষ-জনক মত প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। গয়ার মাজিষ্ট্রেট মণি সাহেবও ঐ সময়ে কুমার সিংহের সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, "দুই এক জনকে ফাঁসী দিলে লোকে ভীত হইতে পারে, উহাতে ফলও ভাল হয়। কিন্তু যেখানে জনসাধারণ আমাদের বিরুদ্ধে থাকে, সেখানে সর্ব্বদা যদি ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইয়া থাকে।" ইহার পর তিনি কুমার সিংহের সম্বন্ধে লিখেন, "কুমার সিংহের স্থায় ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর উপর যদি সন্দেহ করা হয়, এবং তাঁহাকে বিরক্ত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন, অপরেও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতে পারে।" কিন্তু কমিশনর টেলর সাহেব শেষে এই সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, এই সৎপরামর্শ অনুসারে বিশ্বস্ত বৃদ্ধ বন্ধুকে আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালবাসার নিদর্শন দেখাইলেন না। যদিও তাঁহার লেখনী হইতে এক সময়ে কুমার সিংহের রাজভক্তির প্রশংসা-বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল, যদিও তিনি এক সময়ে কুমার সিংহকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়া তাঁহার প্রতি অপরিসীম প্রীতি দেখাইয়াছিলেন, তথাপি সহসা তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। টেলর সহসা কুমার সিংহের রাজ-ভক্তিতে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে পাটনায়

আনিবার জন্য জগদীশপুরে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়া দিলেন।

কমিশনরের নিদেশ-বার্ত্তা লইয়া দূত জগদীশপুরে উপস্থিত হইলেন। কুমার সিংহ রুগ্নশয্যায় শয়ান ছিলেন, এমন সময়ে দূত তাঁহার নিকটে আসিয়া কমিশনরের আদেশ জানাইলেন। কুমার সিংহ দূতের মুখে ধীরভাবে আপনার অবিশ্বস্ততার কথা শুনিলেন, ধীরভাবে পবিত্র মিত্রতার শোচনীয় পরিণাম দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনি দূতের সমক্ষে কোন রূপ অধীরতার পরিচয় দিলেন না, সহসা ক্রোধে বিচলিত হইয়া আত্ম-প্রকৃতির অবমাননা করিলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবে, পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বিকারচিত্তে নিজের বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, কমিশনরের আদেশপালনে প্রথমে আপনার অসামর্থ্য জানাইলেন, শেষে প্রতিশ্রুত হইলেন, শরীর সুস্থ হইলে ও ব্রাহ্মণেরা যাত্রার শুভ দিন ঠিক করিয়া দিলে, তিনি পাটনায় যাইয়া কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এদিকে দূত কমিশনরের আদেশে কুমার সিংহের অবিশ্বস্ততার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, তন্নতন্ন করিয়া তাঁহার অধিকারে সকল বিষয় দেখিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে কুমার সিংহের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তাঁহার লোকদিগকেও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত দেখা গেল না। দূত নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তেজস্বী রাজপুত নিরস্ত হইলেন না। কথিত আছে, এই সময়ে তাঁহার একজন আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে কুমারসিংহ বর-যাত্রীর দলে অধিকসংখ্যক লোক

লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুরুষেরা অকারণে ভীত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অবিচারের উপর অবিচারে বৃদ্ধ রাজপুতের হৃদয় কালীময় হইল। ইঙ্‌রেজ রাজপুরুষের বিচারে তাঁহার জমীদারীর ক্ষতি হইয়াছিল, এখন তাঁহার মর্য্যাদা নষ্ট হইল। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, হৃদয়ের সরলতা ও চরিত্রের সাধুতা দেখাইয়া, পবিত্র মিত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে মিত্রতা হইতে বিষময় ফল ফলিল। রাজপুরুষেরা অকারণে তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিলেন, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন; একজন বিধর্ম্মী লোক অবলীলায় তদীয় অধিকারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিল, তাঁহাকে সামান্য লোক ভাবিয়া, তাঁহার রাজভক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিল। তেজস্বী রাজপুত এ অবমাননা সহিতে পারিলেন না। এ অত্যাচারে, এ অবিচারে অবনত হইয়া থাকিলেন না। তিনি বংশের গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষোচিত সম্মানরক্ষার কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাঁহার বার্দ্ধক্য অন্তর্হিত হইল, জরাজীর্ণ দেহে যৌবনসুলভ তেজস্বিতার আবির্ভাব হইল। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ক্ষত্রিয় বীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, অন্ধবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া ইঙ্গরেজের শোণিতে কলঙ্কের কালিমা মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন।

লর্ড ডালহৌসীর পর-স্বত্ব-সংহারিণী ও পর-রাজ্য-গ্রহণ বিষয়িণী নীতির বিষময় ফল ফলিল। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান

স্থানে একে একে সিপাহি-যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল। পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত, ভয়, বিষাদ ও আতঙ্কের মলিন ছবি বিকাশ পাইল। এই ভীষণ বিপ্লবের সময় কুমার সিংহ যদি ইঙ্গরেজের পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে শাহাবাদে বোধ হয় নর-শোণিতের তরঙ্গ-লীলা দেখা যাইত না, শাহাবাদের ইঙ্গরেজেরা বোধ হয়, সিপাহিদিগের হস্তে নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইতেন না। কিন্তু কুমার সিংহ ইঙ্গরেজ কর্ত্তৃপক্ষের বিচার-দোষে যেরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। শেষে ইঙ্গরেজের বিরোধী সিপাহিরা যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে আপনাদের অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার সমক্ষে ইঙ্গরেজের শোণিতে আপনাদের হস্ত রঞ্জিত করিবে বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল, তখন তিনি বিবেকের বশবর্ত্তী নাহইয়াই তাহাদের সঙ্গে মিশিলেন। ২৭ এ জুলাই দানাপুরের সিপাহিরা আরায় আসিয়া কুমার সিংহের সঙ্গে একত্র হইল। কুমার সিংহের ভ্রাতা অমর সিংহও এই সময়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইঙ্গরেজবিনাশে উদ্যত হইলেন। ক্রমে অনেকে আসিয়া ইহাদের দল পুষ্ট করিতে লাগিল, ক্রমে আরায় ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্য-সাগরের আবির্ভাব হইল। কুমার সিংহ আরার ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন, কয়েদীদিগকে খালাস দিলেন এবং আদালতের কাগজপত্র, সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে কেহ কলেক্টরীর কোনও কাগজ নষ্ট করিল না। কলেক্টরীর কাগজপত্র

নষ্ট হইলে সাধারণের জমীজমার স্বত্বনির্দ্ধারণপক্ষে গোলযোগ হইবে; ইঙ্গরেজেরা যখন এ দেশ হইতে তাড়িত হইবে, সমুদয় রাজ্য যখন আপনাদের হাতে আসিবে, তখন কাগজ-পত্র না পাইলে স্বত্বনির্দ্ধারণের সুবিধা হইবে না ভাবিয়া, কুমার সিংহ কলেক্টরীর কাগজ নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বীরপুরুষের এইরূপ উচ্চ আশা ও গভীর বিশ্বাস ছিল, এইরূপ উচ্চ আশায় ও গভীর বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া বীর-পুরুষ ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। আরার ইঙ্গরেজেরা আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সংগঠিত হইতেছিল, আরার নিকটে যাহারা রেল-ওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপরে এক জন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারের নাম বিকার্স বয়েল। আরায় বিকার্স বয়েলের একটি ছোট দোতলা বাড়ী ছিল। বাড়ীটি প্রথমে বিলিয়ার্ড খেলার জন্য নির্ম্মিত হয়। এই ক্রীড়া-গৃহ এখন ইঙ্গরেজদিগের আত্ম-রক্ষার দুর্গ স্বরূপ হইল। সমুদয় ইঙ্গরেজ দুর্গে সমবেত হইলেন। পঞ্চাশ জন শিখ সৈন্য প্রাণ পণ করিয়া, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দুর্গে স্থান পরিগ্রহ করিল। কুমার সিংহ ঐ দুর্গ নষ্ট করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। প্রথমে দুর্গ-প্রাচীরের নিকটে কতকগুলি ডালপালা ও খড়ের গাদা একত্র করিয়া আগুন দেওয়া হইল। কিন্তু পবনদেব ইঙ্গরেজদিগের অনুকূল ছিলেন, দুর্গে আগুন লাগিল না। যে সকল অশ্ব নিহত ও দুর্গসমীপে স্তূপীকৃত হইয়াছিল, বায়ু অনুকূল হওয়াতে তাহার দুর্গন্ধও ইঙ্গরেজদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। বিপ-

ক্ষেরা কুল্যা খনন করিয়া দুর্গ উড়াইবার চেষ্টা করিল। ইঙ্গরেজেরা প্রতিকুল্যা খনন করিয়া সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। কুমার সিংহ অবশেষে দুইটি কামান আনিয়া দুর্গসমীপে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু উপযুক্ত গোলাগুলি ছিল না, সুতরাং কামানদ্বারা বিশেষ ফললাভ হইল না। কথিত আছে, ইঙ্গরেজেরা এই সময়ে আপনাদের দুর্গের নিকটে আক্রমণ-কারিগণের সম্মুখ-ভাগে কতকগুলি গোরু সারি করিয়া রাখিয়াছিলেন। গোধন বিনষ্ট হওয়ার আশাঙ্কায় কুমার সিংহের লোকেরা ইঙ্গরেজদিগের উপর গুলি চালাইতে পারে নাই। এ দিকে ইঙ্গরেজরা ঐ গো-শ্রেণীর মধ্য দিয়া বিপক্ষের দিকে গুলি বৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজেরা উপস্থিত বুদ্ধি-বলে কিছুকাল এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ কুমার সিংহকে সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। কুমার সিংহ প্রবলপ্রতাপে চারি দিক বেষ্টন করিয়াছিলেন, প্রবলপ্রতাপে সমস্ত আরা আপনার পদানত রাখিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া ঐ প্রতাপ খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী শেষ হইয়া আসিল, ক্রমে তাঁহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, দশ দিক্ আঁধার দেখিতে লাগিলেন, আকাশের দিকে চাহিয়া, ঈশ্বরের কাছে বিমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কুমার সিংহ আরা অবরোধ করিয়াছেন শুনিয়া, দানাপুরের সেনাপতি লয়েড, পাটনার কমিশনর টেলর সাহেবের পরামর্শে কতিপয় ইউরোপীয় ও শিখসৈন্য আরায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সমুদয়ে প্রায়

চারি শত সৈন্য ও পনর জন আফিসর কাপ্তেন ডানবারের অধীনে জাহাজে চড়িয়া, আরার অভিমুখে আসিতেছিল। ২৯এ জুলাই বৈকালে, ইহারা সকলে জাহাজ হইতে নামিল। সৈন্যগণ অনাহারে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং জাহাজ হইতে নামিয়া অনেকে রন্ধনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। আরা যাইবার পথে যে একটি খাল ছিল, তাহা পার হইবার জন্য কেহ কেহ নৌকার অনুসন্ধানে গেল। সকলে সাতটার সময়ে খাল পার হইয়া আরার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। চন্দ্রমা কিরণ-জাল সংযত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতেছে, এমন সময়ে পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ সেনাপতি ডানবারের নিকটে সে রাত্রি বিশ্রাম করিবার জন্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু ডানবার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারজন্য সেই রাত্রিতেই আরার যাইবার আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ চলিতে আরম্ভ করিল, আবার ধীরে ধীরে গভীর নিশীথের শান্তি ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সৈন্যদলের পুরোভাগ আরার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময়ে পথের পার্শ্বস্থিত আম্র কানন সহসা জ্বলিয়া উঠিল, সহসা নিশীথে ভয়ঙ্করী অনল-শিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে আম্রকানন হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া ইঙ্গরেজসৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি হইল, অবিশ্রান্ত গুলির আঘাতে পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি ডানবার নিহত হইলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া পশ্চাৎ হটিয়া শোণ নদের দিকে

আসিতে লাগিল। কুমার সিংহের সৈন্যদল এইরূপে ইঙ্গরেজ সৈন্যের দুরবস্থা ঘটাইল *। আরার অবরুদ্ধ ইঙ্গরেজেরা গভীর নিশীথে দূর হইতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইল না। সাহায্যকারী সৈন্যগণের আর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। বন্দুকের শব্দ একে একে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল, জ্যোতির্ম্ময় আম্রবৃক্ষ সকল একে একে ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল, অবরুদ্ধদিগের হৃদয় একে একে বিষাদ ও হতাশার গভীর কালিমায় আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। রাত্রি শেষে এক জন শিখ ভগ্নদূত বিপক্ষগণের অজ্ঞাতসারে দুর্গে আসিয়া আপনাদের বিষম দুর্গতির সংবাদ জানাইল।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এইরূপ দুর্গতির সংবাদে অবরুদ্ধ ইঙ্গরেজেরা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। পানীয় জল শেষ হইয়া গিয়াছিল; নিদারুণ পিপাসায় সকলের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। দুর্গস্থিত শিখসৈন্য জলের অভাব দেখিয়া কূপখননে উদ্যত হইল। ঐ কূপের জল দিয়া, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের তৃষ্ণা শান্তি করিল। এইরূপে প্রায় এক

* এই সময়ে দুই জন সিবিলিয়ান আপনাদের অসীম সাহসের পরিচয় দেন। এক জনের নাম মাঙ্গল্স্, অপরের নাম মাকডোনল্। মাঙ্গল্স্ একজন চলৎশক্তি-রহিত আহত সৈনিককে পিঠে করিয়া বিপক্ষদিগের গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া চলিয়া আইসেন। ঐরূপ গুলিবৃষ্টির মধ্যে মাক্‌ডোনল নৌকার হাল ঠিক করিয়া দিয়া, অনেকের প্রাণ রক্ষা করেন। এই শেষোক্ত সাহসী পুরুষ আমাদের হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন।

সপ্তাহ অতীত হইল, এক সপ্তাহকাল ইঙ্গরেজরা একটি সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া, যাতনায় একশেষ ভুগিতে লাগিলেন। ২রা আগষ্ট প্রাতঃকালে আবার দূরে বন্দুকের শব্দ আরম্ভ হইল। ঐ দূরাগত ধ্বনি আবার অবরুদ্ধদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নিরাশা, হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

বিন্‌সেণ্ট্ আয়ার নামক এক জন সৈনিক পুরুষ আপনার সৈন্য-দল লইয়া, জলপথে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাইতেছিলেন। দানাপুর হইয়া বক্‌সারে আসিয়া, তিনি আরার ঘটনা শুনিতে পাইলেন। আয়ার পর দিন প্রাতঃকালে গাজীপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে স্থান তখন বড় নিরাপদ ছিল না। এজন্য তিনি তথায় দুইটি কামান রাখিয়া, আবার বক্‌সারে ফিরিয়া আসিয়া, আরায় যাইতে উদ্যত হইলেন। এস্থলে আর এক দল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে একত্র হইল। আয়ার ঐ সকল সৈন্য ও কয়েকটি কামান লইয়া আরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সমস্ত আরা কুমার সিংহের পদানত হইয়াছিল। বৃদ্ধ রজপুত-বীরের প্রতাপে সকলে কম্পান্বিত হইলেও সকলে সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই। কুমার সিংহ নিরীহ লোকদিগের উপর অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কয়েকটি বাঙ্গালী তাঁহার সম্মুখে আনীত হন। ইঁহারা ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন, ইঙ্গরেজের চাকরী করিয়া দিনপাত করিতেন, সুতরাং ইঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, কুমার সিংহ ইঁহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। বাঙ্গা-

লীরা কাতরভাবে, বিশুষ্ক মুখে কুমার সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ রাজপুত বিস্ফারিতচক্ষে গম্ভীরভাবে ইঁহাদের দিকে দৃষ্টি পাত করিলেন, সে দৃষ্টিতে আবেগের লক্ষণ নাই, ক্রূরতার বিকাশ নাই, কঠোরতার পরিচয় নাই, সে দৃষ্টি প্রশান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। কুমার সিংহ প্রশান্তভাবে বাঙ্গালীদিগের দিকে চাহিয়া গম্ভীরোন্নত স্বরে কহিলেন, "নির্ভয়ে স্বদেশে ফিরিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের উপর অত্যাচর করিবে না।" ইহা কহিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তেজস্বী সৌম্য পুরুষ নিরীহ বাঙ্গালীর শোণিতপাত করিয়া আপনার বীর-ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। বৃদ্ধ কুমার সিংহের প্রকৃতি এইরূপ উন্নত ছিল, এইরূপ পবিত্র বীর-ধর্ম্মে তাঁহার হৃদয় অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

সেনাপতি আয়ার ১লা আগষ্ট সন্ধ্যার সময়ে গুজরাজগঞ্জনামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পথের উভয় পার্শ্বস্থ ধান্যক্ষেত্র সকল জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কিয়দ্দূরে পথের সম্মুখে ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ-শ্রেণী ছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতির গাতরোধের জন্য কুমার সিংহ ঐ স্থানে বহুসংখ্য সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। আয়ার ২রা আগষ্ট, প্রাতঃকালে যাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভেরীনিনাদ হইল। ভেরীর গভীর শব্দে সেনাপতি বুঝিতে পারিলেন, অদূরে শত্রুসৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। অনতিবিলম্বে কুমার সিংহের সৈন্য-দল তাঁহার দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হইল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত

হইলেন। এদিকে কুমার সিংহের সৈন্যগণ বৃক্ষ-শ্রেণীর পার্শ্বভাগ হইতে অবিচ্ছেদে গুলি করিতে লাগিল। আয়ার কামানসকল সম্মুখ-ভাগে স্থাপন করিয়া বিপক্ষের দিকে গোলা বৃষ্টি করিবার আদেশ দিলেন। কুমার সিংহের সৈন্যগণের বিশেষ সাহস ও পরাক্রম ছিল। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যাও ইঙ্গরেজদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু তিনি দুই বিষয়ে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন, প্রথম তাঁহার কামান ছিলনা, এদিকে ইঙ্গরেজ সেনাপতি কামানের সাহায্যে শত্রুর দিকে অবিশ্রান্ত গোলা বৃষ্টি করিতেছিলেন, দ্বিতীয়, তাঁহার সৈন্য-দলের বন্দুক উৎকৃষ্ট ছিল না, পক্ষান্তরে বিপক্ষ-গণ উৎকৃষ্ট "স্নাইডর রাইফল" নামক বন্দুকে সজ্জিত ছিল। যুদ্ধাস্ত্রের এইরূপ হীনতায় কুমার সিংহের সৈন্যদল দীর্ঘকাল বিপক্ষের গতি রোধ করিয়া থাকিতে পারিল না। অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে তাহারা হটিয়া যাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজসেনাপতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই রূপে দুই মাইল যাওয়ার পর একটি ক্ষুদ্র নদীতে তাঁহার পথরোধ হইল। নদীর অপর তটে বিবিগঞ্জনামক ক্ষুদ্র পল্লী। নদী পার হওয়ার জন্য যে সেতু ছিল, কুমার সিংহ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। এজন্য আয়ার সে স্থানে নদীপার হইতে পারিলেন না। তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া রেলওয়ের বাঁধের দিকে যাইতে লাগিলেন। ঐ বাঁধ দিয়া আরার দিকে একটি রাস্তা গিয়াছিল, আয়ার উক্ত পথ অব-লম্বন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে কুমার সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত

নদীর অপর তট দিয়া উল্লিখিত বাঁধের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতি তাঁহার দিকে ক্রমাগত কামানের গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু এবার কুমার সিংহ ঐ গোলা-বৃষ্টিতেও নিরস্ত হইলেন না। অপ্রতিহত বেগে, অবিচলিত উৎসাহে, অবারিত বিক্রমে বর্ষীয়ান ক্ষত্রীয় বীর বিপক্ষের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। বিবিগঞ্জের সন্নিহিত ভূখণ্ড ভয়াবহ সমরের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল।

বাঁধের নিকটে বৃক্ষ-সমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্র বন ছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি বাঁধ ছাড়াইয়া আরার পথে উপস্থিত হইতে না হইতেই কুমার সিংহ ঐ বন অধিকার করিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে বনের অন্তরাল হইতে গুলির পর গুলি আসিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্যের উপর পড়িতে লাগিল। গুলির পর গুলির আঘাতে সেনাপতি আয়ারের দলস্থ লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। আর তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। কুমার সিংহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা এই আক্রমণ সহসা নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। বৃদ্ধ রাজপুতের বীরত্ব ও সাহস দেখিয়া ইঙ্গরেজ সেনাপতি চমকিত হইলেন। তিনি বিপক্ষের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ঐ গুলিতে তাহাদের সাহস ও উদ্যম পর্য্যুদস্ত হইল না। কামানের নিকটে যে সকল পদাতিক সৈন্য ছিল, তাহারা কুমার সিংহের আক্রমণে কামান ফেলিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল। বিপক্ষেরা এই অবসরে প্রবলবেগে কামানের নিকটে আসিয়া পড়িল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি আর কোন উপায় না দেখিয়া, সঙ্গীন চালাইতে আদেশ দিলেন, ইঙ্গরেজদিগের

উৎকৃষ্ট সঙ্গীনের সম্মুখে বিপক্ষেরা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ক্রমে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেনাপতি আয়ার ৩ রা আগষ্ট, প্রাতঃকালে আরায় উপনীত হইলেন। আরার অবরুদ্ধ ইঙ্গরেজেরা আপনাদের উদ্ধার-কর্ত্তাকে অক্ষতশরীরে সমাগত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমার সিংহ স্বীয় বাসগ্রাম জগদীশপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ কতিপয় যুদ্ধাহত সিপাহি ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইয়াছিল। সেনাপতি আয়ার ঐ আহত বন্দীদিগের প্রতিও কিছুমাত্র দয়া দেখাইলেন না। তাঁহার আদেশে ছুইজন আহত সিপাহির প্রাণদণ্ড হইল। ইঙ্গরেজ বীরপুরুষ এই রূপে বীরধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়া, ১১ই আগষ্ট জগদীশ-পুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জগদীশপুরে যাইবার পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল। কুমার সিংহ ঐ জঙ্গলে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া বিপক্ষের গতিরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা শেষে ফলবতী হয় নাই। আয়ার জগ-দীশপুরে যাইয়া, কুমার সিংহের সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ করেন। পবিত্র দেবালয়ও তাঁহার করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কুমার সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজ সেনাপতি অসঙ্কোচে উহা বিনষ্ট করিয়া পবিত্র হিন্দু-ধর্ম্মের যারপরনাই অবমাননা করেন। কুমার সিংহের ছুই ভ্রাতা অমর সিংহ ও দয়াল সিংহের বাস-গৃহও ঐরূপে বিধ্বস্ত হয়। জগদীশ-পুরের কিছু দূরে জোতরানামক স্থানে কুমার সিংহের আর

একটি আবাস-বাটী ছিল। সেনাপতি আয়ার সৈন্য পাঠাইয়া, উহা নষ্ট করিয়া ফেলেন।

যখন কুমার সিংহ পরাজিত হইয়া, জগদীশপুর পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বংশের অনেক মহিলা ইঙ্গরেজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হন। ইঁহারা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা, প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় যুদ্ধে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কুমার সিংহ যখন আবাসগৃহ ও পবিত্র দেবালয় ধ্বংসের সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, জগদীশপুরে আসিয়া, তথাকার সমস্ত ইঙ্গরেজ সৈনিক পুরুষকে বধ করেন। ইঙ্গরেজেরা অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। এই সময়ে কুমার সিংহের দলের স্ত্রী পুরুষ, সকলেই যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, বিপক্ষসৈন্য আক্রমণ করে। ক্ষত্রিয়মহিলাগণ অপরিসীম সাহসের পরিচয় দেন। শেষে যখন জয়ের আশা নির্ম্মূল হয়, তখন তাঁহারা আপনাদের কামানের মুখে মাথা রাখিয়া, আপনারাই আপনাদের জীবন নষ্ট করেন। এইরূপে প্রায় দেড়শত রূপবতী যুবতী আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারিণী হন।

জগদীশপুর বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু কুমার সিংহ ধৃত হইলেন না। কেহ কেহ বলেন, তিনি শাশারামের দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আপনাদের হস্তগত করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, একদা তিনি হাতীতে চড়িয়া গঙ্গাপার হইতে-

ছিলেন, এমন সময়ে বিপক্ষের গুলি তাঁহার বাম বাহুতে প্রবিষ্ট হয়। কুমার সিংহ স্বহস্তে আহত বাহু কাটিয়া, "মা গঙ্গে! তোমার সন্তানের এই শেষ উপহার গ্রহণ কর।" বলিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। শেষে ঐ আঘাতেই সেই ভাগীরথীগর্ভে হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুমার সিংহ একটি গল্প বড় ভাল বাসিতেন। কোনও কারণে মন অস্থির হইলেই তিনি তাঁহার কথকের মুখে ঐ গল্প শুনিয়া আমোদিত হইতেন। গল্পটি এই:—একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনার ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরিকে রাজ্য-ভার দিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে নানা স্থানপরিভ্রমণে উদ্যত হন। বিক্রমাদিত্যের যাত্রাকালে ভর্ত্তৃহরি তাঁহার সহিত এই স্থির করেন যে, রাজ্য-মধ্যে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে যদি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা রাজ্য-মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ সাঙ্কেতিক কথাটি প্রচারিত হইলেই, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, রাজ্যে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অসময়ে ছদ্মবেশে দ্বার-দেশে উপনীত হইলে যদি দ্বারবান্ প্রবেশ করিতে না দেয়, তাহা হইলে তাহার কোন সদুপায় করা উচিত মনে করিয়া, উভয় ভ্রাতা আর একটি সাঙ্কেতিক কথা ঠিক করেন। যে সময়েই হউক, বিক্রমাদিত্য দ্বারে আসিয়া দ্বার-রক্ষী দ্বারা ঐ কথাটি জানাইলেই ভর্ত্তৃহরি বুঝিতে পারিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপনীত হইয়াছেন। এইরূপ স্থির হইলে বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলেন। ভর্ত্তৃহরি যথানিয়মে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে রাজ্য-মধ্যে কোন একটি গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইল। ভর্ত্তৃহরি পূর্ব্বপরামর্শ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথাটি রাজ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। বিক্রমাদিত্য উহা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, নীরবে, নিশীথে রাজ-প্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইয়া ভর্ত্তৃহরির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। দ্বাররক্ষক ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে চিনিতে পারিল না, সুতরাং নিশীথসময়ে অপরিচিত, অজ্ঞাত পুরুষকে রাজ-প্রাসাদে যাইতে দিতে সম্মত হইলনা। অবশেষে বিক্রমাদিত্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথাটি ভর্ত্তৃহরিকে জানাইতে কহিলেন। দ্বারবান ভর্ত্তৃহরির শয়নমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই সাঙ্কেতিক কথা উচ্চারণপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া, এই কথাটি বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" ভর্ত্তৃহরি উহা শুনিয়াই অবিলম্বে সন্ন্যাসীকে আপনার কাছে আনিতে আদেশ দিলেন। দ্বাররক্ষক যাইয়া, ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে ভর্ত্তৃহরির অনুমতি জানাইল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভর্ত্তৃহরির শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শয্যার পার্শ্বদিয়া শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ভর্ত্তৃহরি অম্লানভাবে, অবিকারচিত্তে শয্যায় বসিয়া রহিয়াছেন। এই দৃশ্যে তাঁহার বড় বিস্ময় ও কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। তিনি ভর্ত্তৃহরিকে রক্ত-স্রোতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভর্ত্তৃহরি অতি সামান্য ঘটনা বলিয়া উহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে শেষে কহিলেন, "বিষয়টি

অতি সামান্ত। শয্যায় আমার স্ত্রী শয়ানা ছিলেন। দ্বার-রক্ষক আসিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক কথা কহিলে, আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনি দ্বারে উপনীত হইয়াছেন। আপনি এখানে আসিলে আপনার সহিত রাজনীতিঘটিত অনেক গোপনীয় পরামর্শ হইবে। সে সময়ে আমার স্ত্রীর এখানে থাকা অনুচিত। এই নিশীথকালে তাঁহাকে গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিলে, অথবা আমি স্থানান্তরে যাইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেও তিনি নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া ভবিষ্যতে আমায় বড় বিরক্ত করিবেন। এই জন্ত আপনার আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে অসির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া সমস্ত গোলযোগ শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। ইহার পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেই হইবে। ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান থাকিবেনা, গোপনীয় রাজনীতিরও কোন সম্মানহানি হইবে না। আমার স্ত্রীর ছিন্ন দেহ পর্য্যঙ্কের নিম্ন-দেশে রহিয়াছে, সেই দেহ-নিঃসৃত শোণিতপ্রবাহই এখন আপনার দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" ভর্ত্তৃহরির কথায় বিক্রমা-দিত্যের মুখমণ্ডল অধিকতর গম্ভীর হইল, ললাটরেখা উন্নত হইয়া উঠিল। বিক্রমাদিত্য বিস্ফারিতচক্ষে কহিলেন, "ভাই! রাজনীতির বিষয় তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। আমার আর পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন নাই।" ইহা বলিয়া, বিক্র-মাদিত্য পূর্ব্বের ন্তায় ছদ্মবেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই গল্প শুনিলেই কুমার সিংহ বলিয়া উঠিতেন, "ভর্ত্তৃহরি বেশ কাজ করিয়াছেন। রাজনীতির জন্ত এইরূপ সাহস ও এইরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়াই উচিত।" কুমার সিংহ রাজ-

নীতির গৌরব কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজনীতির রহস্যধারণে কতদূর সক্ষম ছিলেন, তাহা উপস্থিত গল্পানুরাগে পরিস্ফুট হইতেছে। সমস্ত শাহাবাদে কুমার সিংহের এমন প্রতাপ ছিল যে, কেহ প্রকাশ্য পথে বা গৃহের বারেন্দায় বসিয়া তামাক খাইতেও সাহস পাইত না। সাহসে ও প্রতাপে, কর্ম্মদক্ষতায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতায় বৃদ্ধ রাজপুতবীর সকলের বরণীয় ছিলেন। জীবনের শেষ দশায় তিনি বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা বা দূরদর্শিতার গভীরতা প্রকাশ পায় নাই।

সংযুক্তা।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ অতীত হইয়াছে। দিল্লীতে চৌহান-কুল-রবি পৃথ্বীরাজ আধিপত্য করিতেছেন। কান্য-কুব্জ রাঠোর-কুল-শ্রেষ্ঠ জয়চন্দ্রের পদানত রহিয়াছে। মিবার পরাক্রান্ত সমরসিংহের শাসন-মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে পবিত্রচিত্ত আর্য্য মহাপুরুষগণ স্বাধীনভাবে আপ-নাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি-কলাপ চারণদিগের ছন্দোময়ী গীতিকায় নিবদ্ধ হইয়া, চারি-দিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। আর কান্যকুব্জ-লক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ম্বরোৎসবের কাহিনী প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দের রসময়ী কবি-তায় গ্রথিত হইয়া, রসজ্ঞ লোকের মুখে মুখে লীলা করিয়া বেড়াইতেছে।

সংযুক্তা কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্রের দুহিতা। ১১৭০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সংযুক্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কেবল অনুপম সৌন্দর্য্য ছিল না। ঐ সৌন্দর্য্যের সহিত অসাধারণ উদারতা ও অসাধারণ মনস্বিতাও ছিল। আজ মহারাজ জয়চন্দ্রের রাজধানীতে এই মহালক্ষ্মীর স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ভারতের বাহুবলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ আজ এই অতুল্য ললনারত্ন লাভের জন্য কান্যকুব্জে সমাগত হইতে লাগিলেন।

আত্ম-বিগ্রহে ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আত্মবিগ্রহের সুযোগে বিদেশী মুসলমান ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। উপস্থিত সময়ে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধাদি হইত। এই আত্মবিগ্রহে শেষে দিল্লী ও কান্যকুব্জ, উভয়েরই পতন হয়। উভয় জনপদই মহম্মদ গোরীর অধীনতা স্বীকার করে।

মহারাজ জয়চন্দ্র কান্যকুব্জলক্ষ্মী সংযুক্তার স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই শেষ বার ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে ক্ষত্রিয় রাজগণের অভীষ্ট মহাযজ্ঞ সম্পাদনের আয়োজন হয়। আত্ম-বিগ্রহ প্রযুক্ত যজ্ঞস্থলে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও তদীয় পরমবন্ধু মিবারপতি সমরসিংহের আগমন হইল না। ইঁহারা উভয়েই জয়চন্দ্রের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। জয়চন্দ্র এজন্য অভিমানী হইয়া, পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের দুইটি হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়, দ্বাররক্ষক ও স্থালীপরিষ্কারকের বেশে সজ্জিত

হইয়া সভামণ্ডপে স্থাপিত হইল। এদিকে রাজসূয়ের কার্য্য শেষ হইলে সংযুক্তার স্বয়ম্বরের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ভারতের গুণ গৌরব-শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণ একে একে কান্যকুব্জের স্বয়ম্বর-সভা অলঙ্কৃত করিতে লাগিলেন। রাজগণের অধিবেশনের পর সংযুক্তা স্বয়ম্বরোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, হস্তে বর-মালা লইয়া ধাত্রীর সহিত সভাগৃহে সমাগত হইলেন।

যে গুণানুরাগ হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া, মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে, তাহা কখনও সামান্য বাহ্য আবরণে নিবারিত হয় না। সংযুক্তা ইহার পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের অলোকসামান্য গুণ, অলোকসামান্য বীরত্বের বিবরণ শুনিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন। এখন পিতার শত্রুতায় সে আসক্তি নিরাকৃত হইল না। তিনি সাহসের সহিত পৃথ্বীরাজকেই বর-মাল্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুশোভন সভামণ্ডপস্থ সুসজ্জিত রাজগণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল না। সংযুক্তা সকলকে অতিক্রম করিয়া, পৃথ্বীরাজের হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির গলদেশে বরমাল্য সমর্পণ করিলেন। জয়চন্দ্র দুহিতার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যে ম্রিয়মাণ হইলেন, স্বয়ম্বর-স্থলীর রাজগণ তাদৃশ রূপ-গুণসম্পন্ন ললনা-রত্ন লাভে হতাশ হইয়া আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সংযুক্তার মাল্যার্পণ-সংবাদ দিল্লীশ্বরের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। সংবাদ পাওয়া মাত্র, তিনি সৈন্যদল লইয়া কান্যকুব্জে আসিয়া, সংযুক্তাকে পিতৃভবন হইতে হরণ করিলেন। জয়চন্দ্র কন্যারত্নের উদ্ধারার্থ যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন। কান্যকুব্জ হইতে দিল্লীতে যাইবার পথে, পাঁচ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে

ঘোরতর সংগ্রাম হইল। শেষে পৃথ্বীরাজ জয় লাভ করিলেন। জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষুব্ধহৃদয়ে কান্যকুব্জে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল *।

পৃথ্বীরাজ ঐ অসামান্য ললনা-রত্নের অধিকারী হইয়া, অক্ষুণ্ণ তরঙ্গিতচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সংযুক্তার অসাধারণ গুণে স্বর্গ-সুখও তাঁহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল। সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্ত্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন এইরূপ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন, সংযুক্তা যখন এইরূপ পতিসোহাগিনী হইয়া আহ্লাদ-সাগরে ভাসিতেছিলেন, তখন দুরন্ত সাহাবুদ্দীন ঘোরী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। সংযুক্তা আসন্ন শত্রুর হস্ত হইতে মাতৃভূমি রক্ষা করিতে যত্নপর হইলেন। কিরূপে যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে যবন-গ্রাস হইতে ভারতভূমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তাকে চতুরঙ্গ সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া, শীঘ্রই রণক্ষেত্রে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সংযুক্তার যত্ন

* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে দ্বাররক্ষকের পদে স্থাপিত করাতে পৃথ্বীরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া, সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে আগমন পূর্ব্বক জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহার পর সংযুক্তা পিতৃকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করেন, তিনি পৃথ্বীরাজকেই বিবাহ করিবেন। পৃথ্বীরাজ লোকপরম্পরায় ঐ সংবাদ শুনিয়া পুনর্ব্বার কান্যকুব্জে আসিয়া, সংযুক্তাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন।

কেবল ঐ অনুরোধমাত্রেই শেষ হইল না। তিনি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ একত্র করিয়া, গম্ভীর স্বরে পৃথ্বীরাজকে কহিলেন,—“জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমরা আজ যে জীবন-স্রোতে দেহ ভাসাইয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করিতেছি, হয় ত কালই তাহা অনন্তকালসাগরে বিলীন হইতে পারে। ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকৃষ্ট হইয়া, যশের চিরন্তন সুখে জলাঞ্জলি দেওয়া বিধেয় নহে। যিনি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না ভাবিয়া অমরতার দিকে মনোযোগী হইবে। তোমার করস্থিত শাণিত অসি শত্রুর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার অধিষ্ঠিত তেজস্বী অশ্ব শত্রুর শোণিত-স্রোতে সন্তরণ করুক, তোমার চতুরঙ্গ সৈন্যদল “হর হর” ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করুক। এই মহৎ কার্য্যে মৃত্যুকে ভয় করিও না, রণস্থলবর্ত্তিনী করাল সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হইও না। সাহস, উদ্যম যত্নের সহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর, আমি পরলোকে তোমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইব।” বীর-বালা বীর-জায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজস্বি বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ তেজস্বিতা পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

অবিলম্বে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল। ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর এই মহা যুদ্ধে শরীর ও মন উৎসর্গ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্য-কুলের “হর হর” ধ্বনিতে চারি দিক কম্পিত হইতে লাগিল। হিন্দুরাজ-চক্র-

বর্ত্তী পৃথ্বীরাজ এই সেনার অধিনায়ক হইয়া সাহাবদ্দীনকে সমরে আহ্বান করিলেন। উত্তর ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে (তিরৌরী ক্ষেত্র) উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম হইল। যবন সৈন্য ক্ষত্রিয় বীরগণের দুর্ব্বার পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, শত্রুর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র, পৃথ্বীরাজের করগত হইল। সাহাবদ্দীন গোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিল। পৃথ্বীরাজ বিজয়ী হইয়া মহা উল্লাসে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরাজিত হইবার দুইবৎসর পরে সাহাবদ্দীন আবার ভারতবর্ষে উপনীত হইল। এবারেও পৃথ্বীরাজ যুদ্ধার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত সভা সংগঠিত হইল, নানা স্থান হইতে সৈন্যগণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে আসিয়া অধিনায়কের সংখ্যা বাড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই দিল্লীতে পুনর্ব্বার বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব হইল।

মহাবীর সমর সিংহ এই সময়ে দিল্লীতে আসিয়া, যুদ্ধের প্রণালীসম্বন্ধে যে সকল মত ব্যক্ত করিলেন, পৃথ্বীরাজ তাহা যত্নের সহিত লিখিয়া লইলেন। এদিকে যুদ্ধ-যাত্রীর সকলেই স্ব স্ব পরিবারবর্গের নিকটে বিদায় লইল। মাতা, দুহিতা, স্ত্রী, সকলেই তাহাদিগকে "রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা রণ-ভূমিতে দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ," বলিয়া বিদায় দিল। সংযুক্তা ভর্ত্তাকে বীরবেশে সজ্জিত করিলেন, সাজাইতে সাজাইতে হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল, হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল। সংযুক্তা অনিমেষলোচনে পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন, অতর্কিতভাবে কয়েকটি

মুক্তাফল কপোলবহিয়া বক্ষে পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ কাল-বিলম্ব না করিয়া, সৈন্যদল লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। সংযুক্তা ভর্ত্তার গমন-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাসসহকারে কহিলেন, "স্বর্গ ব্যতিরিক্ত বোধ হয়, আর এই যোগিনীপুরে (দিল্লীতে) দয়িতের সহিত সম্মিলন হইবে না।"

পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতীর তটে উপস্থিত হইলেন। চতুর মুসলমান নদীর অপর তট হইতে চাতুরী-জাল বিস্তার করিল। হিন্দুগণ চতুরের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। সাহাবুদ্দীন ঐ সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। হিন্দু সৈন্য তাড়াতাড়ি অস্ত্র লইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান ছিল, ততক্ষণ তাহারা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহরক্ত ভারত-ভূমির ক্রোড়শায়ী হইতে লাগিল। তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর, সমর সিংহ সমরক্ষেত্রে বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। পৃথ্বীরাজ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া বন্দীভূত ও শেষে শত্রুর হস্তে নিহত হইলেন। ক্ষত্রিয়-শোণিতে ভারতের দেহ কলঙ্কিত হইল, ক্ষত্রিয়-শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লাগিল, সংযুক্তার অমঙ্গল আশঙ্কা ফলে পরিণত হইয়া গেল।

অবিলম্বে এই সাংঘাতিক সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র সংযুক্তা চিতা সজ্জিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতানলের শিখা গগন স্পর্শ করিল। সংযুক্তা বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রক্তবস্ত্র-পরিহিত ও

রত্নমাল্যে ভূষিত হইয়া ঐ অনলে প্রবেশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে তাঁহার অনুপম লাবণ্য-ভূমি কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে ছাড়িয়া যত দিন রণভূমিতে ছিলেন, ততদিন কেবল জল সংযুক্তার জীবন-রক্ষার অবলম্বন ছিল। চাঁদ কবির গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সংযুক্তার এই অসাধারণ পাতিব্রত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। সংযুক্তা পতিব্রতার দৃষ্টান্ত-ভূমি, স্বর্গস্থ দেবী-সমাজে বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় সাবিত্রীর শ্রেণীতে তাঁহার নাম সমাবেশিত হইবার যোগ্য।

এক্ষণে প্রাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে সংযুক্তাঘটিত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। যে দুর্গ সংযুক্তার বিলাস-ক্ষেত্র ছিল, তাহার প্রাচীর আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে প্রাসাদে সংযুক্তা পতিসোহাগিনী হইয়া অবস্থান করিতেন, তাহার স্তম্ভ-রাজি আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন দিল্লীর ভগ্নাবশেষ শোভিত করিতেছে। কালের কঠোর আক্রমণে এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এক সময়ে ঐ ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি অন্য প্রাসাদের দেহ পরিপুষ্ট করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী সংযুক্তা কখনও এই জগৎ হইতে অন্তরিত হইবেন না। তাঁহার পতিপ্রেম, তাঁহার পাতিব্রত্য, তাঁহার মহাপ্রাণতা, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসে জাজ্বল্যমান রাখিবে।

রাজসিংহের রাজধর্ম্ম।

দুরন্ত আওরঙ্গজেব দিল্লীর ময়ূরাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। বিশ্বাস-ঘাতকের বিশ্বাস-ঘাতকতায় রাজত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সহোদরগণ ঘাতকের হস্তে রাজ্যপ্রাপ্তির আশার সহিত আত্মপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। নিষ্ঠুর সম্রাট্ দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয়স্বজনের শোণিতপাত করিয়া, চিরভক্তিভাজন জনককে শোচনীয় অবস্থায় ফেলিয়া, অকাতরে সাম্রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। এই সময়ে দুইজন হিন্দু বীরপুরুষ ধর্ম্মান্ধ ও তেজান্ধ সম্রাটের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্র-রাজ শিবজী অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত হিন্দুর গৌরব রক্ষা করেন, আর আর্য্যাবর্ত্তে মিবারের অধিপতি রাণা রাজসিংহ লোকাতীত দৃঢ়তার সহিত প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় দেন।

আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্ধতার সহিত তাঁহার ভোগ-বিলাস-স্পৃহা বাড়িতে লাগিল। তিনি রূপনগরের অধিপতি বিক্রমশোলাঙ্কীর লাবণ্যবতী তনয়ার পাণিগ্রহণে উদ্যত হইলেন। রাজপুত-বালাকে আনিবার জন্য অবিলম্বে রূপনগরে দুই হাজার অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কিন্তু তেজস্বিনী রাজপুতকুমারী ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, বিধর্ম্মী মোগলের মহিষী হইয়া আপনার প্রাতঃস্মরণীয়

বংশের, আপনার চিরপবিত্র ধর্ম্মের অবমাননা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ঘৃণা ও বিরাগের সহিত মোগল সম্রাটের দাম্ভিকতার সমুচিত প্রতিশোধ দিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার স্মৃতিতে রাণা রাজসিংহের অলোকসাধারণ গুণগ্রাম বিরাজ করিতেছিল। রূপনগরের রাজবালা ঐ অলৌকিক গুণ-সম্পন্ন পুরুষ-সিংহের অঙ্কলক্ষ্মী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন মোগলের অবৈধ প্রস্তাব শুনিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্রোধে ও অভিমানে তেজস্বিনী রাজবালা রাণা রাজসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজহংসী সারসের সহচরী হইবে? যে রাজপুতকুমারীর দেহে পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সে বানরমুখ অসভ্যকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে? যদি আমার সম্মান রক্ষা করা না হয়, যদি চিরপবিত্র আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকে, যবনের কঠোর হস্ত যদি আমাদের চিরন্তন মর্য্যাদার বিলোপসাধনে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমাদের বংশের প্রাতঃস্মরণীয়া পদ্মিনী প্রভৃতি যে পথ অবলম্বন করিয়া অন্তিমে অনন্ত সুখের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, আমিও অকাতরে সেই পথ অবলম্বন করিব।" রূপনগরের পূজনীয় কুল-পুরোহিত রাণা রাজসিংহের নিকটে যাইয়া, রাজপুত-বালার এই কথা জানাইলেন। রাজসিংহ আপনাদের বংশ-মর্য্যাদার সম্মান রাখিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি একদল সাহসী রাজপুত যোদ্ধা লইয়া আরাবলির পাদদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক রূপনগরে উপনীত হইলেন। তাঁহার পরাক্রমে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল। তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় বালাকে উদ্ধার করিয়া,

আপনার রাজধানীতে আনিলেন। প্রবল-প্রতাপ মোগল-শাসনে রাজপুতের রাজ-ধর্ম্মের সম্মান রক্ষিত হইল।

এদিকে অপকর্ম্ম-কারক আওরঙ্গজেবের অপকর্ম্মের শান্তি হইল না। দুরাচার সম্রাট হিন্দুদিগকে অধিকতর নিগৃহীত করিবার জন্য "জিজিয়া" কর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই কর কেবল হিন্দুদিগকেই দিতে হইত। তাঁহার আদেশে আম্বের-রাজ জয়সিংহ পরাক্রান্ত শিবজীর প্রতাপ খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে দক্ষিণাপথে অবস্থিতি করিতেছিলেন, মাড়বারের অধিপতি পরাক্রান্ত যশোবন্ত সিংহ রাজকীয় কার্য্যসাধনের জন্য কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই মোগল-রাজত্বের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। মোগল সম্রাট ইহাদের ক্ষমতা, ইহাদের বিশ্বস্ততা ও ইহাদের কার্য্যকুশলতার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক সময়ে অনেক সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইতেন। "জিজিয়া" কর স্থাপনের সময়ে পাছে ইহারা ঘোরতর আপত্তি করিয়া অভীষ্ট বিষয়ের অন্তরায়স্বরূপ হন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব গোপনে বিষ-প্রয়োগ করিয়া উভয়েরই প্রাণ নাশ করিবার আদেশ পাঠাইলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। বিশ্বস্ত রাজপুতদ্বয় আপনাদের বিশ্বস্ততা দেখাইতে গিয়া, বিদেশে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। যশোবন্তের মহিষী আপনার শিশু পুত্র অজিত সিংহকে লইয়া কাবুল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতেছিলেন; মোগল সম্রাট তাঁহাদিগকে অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষক পরাক্রান্ত দুর্গাদাস এই আদেশে অবনত-মস্তক হইলেন না।

আড়াই শত মাত্র সাহসী রাজপুত, একটি গিরিসঙ্কটে পাঁচ হাজার মোগল সৈন্যকে আটক করিয়া রাখিল। এই অবসরে যশোবন্তের বনিতা নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন। এদিকে রাজসিংহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়া, অজিত সিংহ ও তাঁহার মাতাকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার আদেশে ইঁহাদের আবাস-স্থান* নিরূপিত হইল, তাঁহার আদেশে মোগল সম্রাটের আক্রমণ হইতে ইঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সাহসী রাজপুতগণ নিয়োজিত হইতে লাগিল। রাণা রাজসিংহ স্বয়ং ইঁহাদের প্রধান রক্ষক হইলেন। ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ, ক্রূর-প্রকৃতি আওরঙ্গজেবের কঠোর আদেশে উপেক্ষা করিয়া, নির্ভীকচিত্তে অনাথ শিশু ও তদীয় অনাথা জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

আওরঙ্গজেবকে "জিজিয়া" কর স্থাপনে উদ্যত দেখিয়া রাণা রাজসিংহ মর্ম্মাহত হইলেন। ভারতভূমিতে চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দু-জাতির অবমাননা হইবে, আর্য্যগণ বিধর্ম্মী মুসলমানের অত্যাচারে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে থাকিবে, ধর্ম্মান্ধ সম্রাট আপনার ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বাদ দিয়া, অর্থের জন্য কেবল হিন্দুদিগকেই তাড়না করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এ ক্ষোভ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। রাজ-ধর্ম্মবিৎ রাজশ্রেষ্ঠ নির্ভয়ে ঐ অনুচিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার ধমনীতে শোণিত-বেগ খরতর হইল, হৃদয়ে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা বিকাশ পাইল, মনে ক্ষোভ, রোষ ও অপমান, একবারে আসিয়া তুমুল সংগ্রাম বাধাইল। তিনি হিন্দুগণের অধিনায়ক স্বরূপ হইয়া হিন্দু জাতির সম্মানিত নামে আওরঙ্গজেবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন:—

"সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হউক। সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবান্বিত আপনার বদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ক্রটি নাই। এই হিন্দুস্থানের রাজা, রায় ও সম্ভ্রান্তগণের, ইরাণ, তুরাণ, শাণ ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তঋতু জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও জলপথ যাত্রিগণের সর্ব্বাঙ্গীন উপকারসাধনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। এবিষয়ে বোধ হয়, আপনার কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য আমি আমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া এবং আপনার শীলতা ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের স্বার্থ-সংসৃষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

"আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন এবং আপনার শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

"আপনার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ জালাল উদ্দীন আকবর সমদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত বায়ান্ন বৎসরকাল এই সাম্রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বে সকল জাতির লোকই সুখস্বচ্ছন্দে ছিল। ঈশা, মূসা বা মহম্মদের শিষ্যই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতিই অনুগ্রহ ও শীলতা প্রদর্শন

করিতেন। এইরূপ সমদর্শিতার জন্ম, তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতার আবেশে তাঁহাকে জগদ্গুরু বলিয়া অভিহিত করিত।

"স্বর্গীয় নুরউদ্দীন জাহাঁগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজা পালন করিয়াছেন। মিত্ররাজগণের প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রদর্শন করাতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন।

"মহিমান্বিত শাহ্ জহাঁ বত্রিশ বৎসর শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া, দয়া ও ধর্ম্মের গৌরবযুক্ত পুরস্কার—অক্ষয় সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন।

"আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের লোক-হিতকর কার্য্য এইরূপ। তাঁহারা এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ করিতেন, সেই খানেই বিজয়লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য শ্রী তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইত। তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ, সাম্রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছে। এখন অত্যাচার ও অবিচারস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান ঐরূপ হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। আপনার প্রজাগণ পদ-দলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ দুঃখদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হন, তখন সম্ভ্রান্ত লোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে? সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাত্রিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে।

"যে রাজাধিপতি এরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর কর-ভারে নিপীড়িত করিবার জন্য আপনার ক্ষমতা বিনিয়োগ করেন, তাঁহার মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দ্দশার সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ তৈমূরবংশের গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জ্জন-স্থানবাসী নিরপরাধ তপস্বীদিগের উপর আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিরই ঈশ্বর; তিনি কেবল মুসলমানদের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতি মাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বের আদি কারণ। আপনাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ঘণ্টা-ধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। অপরাপর লোকের ধর্ম্ম ও অত্যাচারের অবমাননা করা, আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত কাজ করা, উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতই আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। এই জন্য কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে।

"আপনি হিন্দুদিগের নিকট যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়পরতার বহির্ভূত। উহা সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত

নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকন্তু উহা হিন্দুস্তানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি আপনার ধর্ম্মান্ধতা আপনাকে ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের প্রধান রামসিংহের নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার এই শুভকাঙ্ক্ষীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও প্রকৃত মহানুভাবকত্বের লক্ষণ নহে। আপনার অমাত্যগণ যে, ন্যায়পরতা ও সম্মানের সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আপনাকে সদুপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে।”

রাণা রাজসিংহের পত্রে এইরূপ শীলতা অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা ও এইরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত দিল্লীর সম্রাটকে অপকর্ম্মে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজনীতির উচ্চতায়, ভাবের গভীরতায়, উদারতার মহিমায় ও প্রকৃত বীরত্বের অপূর্ব্বমাদকতায়, ঐ পত্র পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের, যে কোন সময়ের রাজনীতিজ্ঞের নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পারে। ঐ পত্রের প্রতি অক্ষরে হিন্দু আর্য্যের প্রকৃত হিন্দুত্ব পরিস্ফুট হইতেছে এবং হিন্দু রাজার প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ঐ পত্র ও যশোবন্ত সিংহের স্ত্রীর বিমুক্তির সংবাদ পাইয়া, দুর্বৃত্ত সম্রাট ক্রোধে অধীর হইলেন। ক্রোধের আবেগে তিনি রাণা রাজসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগি-

লেন। এই জন্য বঙ্গদেশ, কাবুল ও দক্ষিণাপথ হইতে তাঁহার পুত্রগণ রাজধানীতে আসিলেন। ইঁহাদের হস্তে এক এক দল সৈন্যের পরিচালনভার সমর্পিত হইল। দুরাচার আওরঙ্গজেব এইরূপে বহু সেনাপতি ও বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া মিবারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজসিংহও আপনাদের বংশের গৌরবরক্ষায় উদাসীন ছিলেন না। তিনি সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগের অধ্যক্ষতা জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহের উপর সমর্পণ করিলেন। ভীমসিংহ অন্য ভাগের অধিনায়ক হইলেন। রাণা স্বয়ং প্রধান ভাগের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া সম্রাটের গতিরোধার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ও আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু-সূর্য্যের সাহায্যের জন্য মিবারের রক্তবর্ণ পতাকার অধীনে সজ্জিত হইল।

মিবারের অধিপতি এই সকল সাহসী সৈন্য ও আরাবলি পর্ব্বতের উপর নির্ভর করিয়া দুরাচার মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইলেন। রাজকুমার জয়সিংহের পরাক্রমে বিপক্ষের খাদ্য সামগ্রী আনয়নের পথ নিরুদ্ধ হইল। আওরঙ্গজেব দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাহারে কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগি-লেন। তাঁহার শিবিরে নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইল। তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী রক্ষকগণে পরিবৃত হইয়া, পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি রাজসিংহের নিকটে আনীত হইলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে সমুচিত আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং সমুচিত আদর ও সম্মা-নের সহিত উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া আওরঙ্গজেবের নিকটে

পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে মোগলের খাদ্য সামগ্রী আনয়নের পথ বিমুক্ত হইল। তিনি পরাক্রান্ত শত্রুরও অনাহার-কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। রাজসিংহ বিধর্ম্মী বিপক্ষের খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়া, তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। রাজপুতবীরের হৃদয় এইরূপ উচ্চতর গুণে অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ উচ্চতর রাজধর্ম্মে রাজপুতবীর প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি, দুরাশয় মোগল ঐ উচ্চতর গুণ ও ঐ উচ্চতর রাজ-ধর্ম্মের সম্মান রাখিলেন না। তিনি রাণার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষত্রিয় বীর ইহাতে কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ বিপুল সাহসসহকারে শত্রুর সম্মুখীন হইল। আওরঙ্গজেব বহু চেষ্টা করিয়াও তেজস্বী রাজপুতগণের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পতাকা, তাঁহার হস্তী, তাঁহার যুদ্ধাস্ত্র বিজয়ী রাজসিংহের হস্তগত হইল। ১৭৩৭ সংবতের ফাল্গুন মাসে ঐ মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ১৭৩৭ সংবতে পুণ্যপুঞ্জময় রাজপুতভূমিতে রাণা রাজসিংহ বিজয়লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ১৭৩৭ সংবতের মধুর বসন্ত কালের বাসন্ত উৎসবের মধ্যে মিবারের হিন্দু নরপতি শত্রুর সম্মুখে আপনার লোকাতীত সাহস ও শূরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজসিংহ যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পলায়িতদিগের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন নাই। ভীমসিংহ গুজরাট আক্রমণ করিয়া সুরাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই স্থানে বহুসংখ্য

লোক পলায়িতভাবে ছিল। রাজসিংহ ইহাদিগকে নিপীড়িত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। দয়া, ধর্ম্ম ও সৌজন্যের উপদেশ তাঁহার নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। তিনি ভীমসিংহকে সুরাট আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

রাজসিংহ আপনার উদারতাগুণে এইরূপে প্রকৃত রাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আপনার ঘোরতর শক্রকেও অনাহারে কষ্ট দেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন মোগলের আহারীয় সামগ্রী আনয়নের পথ রুদ্ধ করেন এবং বিপক্ষকে আহারে নিপীড়িত করিয়া প্রায় আপনার পদানত করিয়া তুলেন, তখন রাজসিংহই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে বিরত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি আপনার রাজ্য বিপদাপন্ন করিয়া যশোবন্তসিংহের শিশু সন্তানকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সম্রাটের অধিকতর কোপে পতিত হইবেন জানিয়াও, গরীয়সী কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুরোধে "জিজিয়া" করের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং আপনার সৈন্যদিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও রূপনগরের তেজস্বিনী রাজবালার উদ্ধারসাধন পূর্ব্বক সুরাজমহিমার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। সাহসে, বীরত্বে ও আপনার রাজ্যরক্ষণে তিনি প্রশংসার অতীত, রাজ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা-পালনে তিনি সমসাময়িক ইতিহাসে অদ্বিতীয়, দুরাচারের দৌরাত্ম্যদমনে তিনি সকলের অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই তাঁহার অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও তাঁহার অপূর্ব্ব মনস্বিতার পরিচয় দিতেছে। তিনি নিঃস্বার্থ পরোপকার-ব্রতকেই আপনার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে

করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ-সমুদ্রে* তদীয় শিল্পবিষয়িণী সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত ঐ শিল্প-কীর্ত্তি রাজপুতনার শোভা সম্পাদন করিতেছে।

বীরযুবকের দেশভক্তি।

খ্রীঃ ১৫৪৩ অব্দ অতীত হইয়াছে। শের শাহের অমিত-পরাক্রমে দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন দেশত্যাগী হইয়াছেন। যিনি

* রাণা রাজসিংহের আধিপত্যকালে মিবারে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। বহুসংখ্য প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। যাহাতে প্রজাকুল কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে, অথচ রাজ্যমধ্যে একটি প্রধান কীর্ত্তি স্থাপিত হয়, রাজসিংহের তাহাই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে রাজসমুদ্রের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজ-সমুদ্র একটি বৃহৎ সরোবর। উহা মিবারের রাজধানীর ২৫ ক্রোশ উত্তরে এবং আরাবলি পর্ব্বতের পাদদেশের প্রায় ২ মাইল অন্তরে অবস্থিত। গোমতী নামে একটী বক্রগতি গিরিনদীর স্রোত একটি বিশাল বাঁধ দ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া, ঐ হ্রদ প্রস্তুত করা হয়। রাজসিংহ আপনার নামানুসারে উহার নাম "রাজসমুদ্র" রাখেন। রাজ সমুদ্রের উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব ব্যতীত সকল দিকেই উক্ত বিশাল বাঁধ বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ বাঁধ শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরের নির্ম্মিত। বাঁধের শীর্ষভাগ হইতে সরোবর-গর্ভ পর্য্যন্ত শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরের সোপানাবলী সরোবরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সরোবর অতি গভীর। উহার পরিধি প্রায় ১২ মাইল। উক্ত বাঁধ একটি উচ্চ মৃৎপ্রাকারে পরিবেষ্টিত। রাণা, সরোবরের দক্ষিণে একটি নগর ও দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নগর তাঁহার নামানুসারে "রাজনগর" নামে অভিহিত হয়। বাঁধের উপরিভাগে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের একটি সুন্দর দেবমন্দির প্রস্তুত হয়। এই কার্য্যে ৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল এবং ইহা শেষ হইতে ৭ বৎসর লাগিয়াছিল।

এক সময়ে মণিমুক্তায় পরিশোভিত হইয়া দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, তিনি আজ ভিখারী হইয়া দেশা-ন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। পরপ্রদত্ত সাহায্যে এখন তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে; আপনার জন্য, প্রেমপ্রতিমা প্রণয়িনীর জন্য, প্রাণাধিক তনয়ের জন্য, তিনি এখন সর্ব্বাংশে পরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর আকবরের পিতা এক সময়ে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। আর যিনি ক্ষমতাবলে কাবুলের পার্ব্বত্য প্রদেশে, আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র ভূমিতে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে বিজয়-পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি বিস্তীর্ণ ভারতমরুর এক খণ্ড ওয়েশিসের সামান্য গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরকীয় সাহায্যে সামান্যভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

শের সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকা এখন মোগলবংশের পরিবর্ত্তে শূরবংশের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। আমীর ওমরাহগণ এখন মোগলবংশধরের পরিবর্ত্তে শূরবংশধরের আদেশ প্রতি-পালন জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। শের শাহ আপনার বীরত্বে ও তেজস্বিতার বলে হুমায়ুনকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতের সকল স্থানে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, এখন তিনি রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্কল্প করিলেন। বীরভূমি রাজপুতনা তাঁহার লক্ষ্য হইল। শের শাহ আশীহাজার সৈন্য লইয়া মাড়-বার আক্রমণ করিলেন।

মাড়বার প্রকৃতির কমনীয় শোভায় অলঙ্কৃত নহে। মনো-

চয় বৃক্ষলতা বা শস্য-সমাকীর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে উহার সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বিস্তীর্ণ বালুকাসমুদ্র নিরন্তর মাড়বারের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে। মাড়বার প্রকৃতির মনোহারিণী শোভার পরিবর্ত্তে ভয়ঙ্কর ভাবের অপূর্ব্ব বিকাশক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। উপস্থিত সময়ে পরাক্রান্ত রাঠোরগণ আপনাদের লোকাতীত বীরত্বের মহিমায় এই মরুস্থলীর স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। শের শাহ আজ এই গৌরব হরণে উদ্যত হইলেন। আশী হাজার সৈনিক পুরুষ বিপুলবিক্রমে মাড়বারের অভিমুখে আসিতে লাগিল। সংবাদ মরুস্থলীতে প্রচারিত হইল। রাঠোরগণ আপনাদের গরীয়সী জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্য সৈন্য সমবেত হইল। দেখিতে দেখিতে মরুস্থলীর অধিপতি মহারাজ মালদেব পঞ্চাশ হাজার তেজস্বী রাঠোরের বাহু-বলের উপর নির্ভর করিয়া, দিল্লীর অভিনব সম্রাটের গতি রোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন।

বীরভূমির বীরত্বের গৌরব অক্ষত রহিল। পঞ্চাশ হাজার রাঠোরের পরাক্রমে দিল্লীর আশী হাজার সৈন্যের গতিরোধ হইল। হুমায়ুনের বিজেতা আজ মরুস্থলীর বীরগণের বীরত্বের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন। মালদেবের ব্যূহভেদ করা অসাধ্য দেখিয়া, শের শাহ প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু রাঠোর সৈন্যের বিক্রমে তাহাও ব্যর্থ হইল। চতুর মুসলমান ভূপতি অতঃপর চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুসলমানের চাতুরীবলেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সাহবুদীন ঘোরীর চাতুরীতে

পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতীর তটে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। আলা উদ্দীনের চাতুরীতে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি পদ্মিনীর কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে। আজ শের শাহের চাতুরীতে রাঠোরভূমির সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইল। শের শাহ আপনার নামে এক খানি পত্র লিখিলেন। বিশেষ কৌশলের সহিত পত্রে মালদেবের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের নাম জাল করা হইল, যেন সর্দ্দারগণ শের শাহকে লিখিতেছেন যে, তাঁহারা মালদেবের উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে সকলেই আপন আপন সৈন্যদল লইয়া দিল্লীর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবেন। চতুর মুসলমানের কৌশলে পত্র মালদেবের হাতে গেল। পত্র পাইয়া, মালদেব স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধিহইলেন, আপনার সর্দ্দারদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। চতুরের চাতুরী ফলবতী হইল। মালদেব আপনার সর্দ্দারগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্‌যোগ করিলেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে তেজস্বী রাঠোর সর্দ্দার কুম্ভের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কুম্ভ মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন, সনাতন ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া আপনাদের বিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন, দুরন্ত যবনের চাতুরীর কথা কহিয়া পবিত্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মালদেব কিছুই শুনিলেন না, কিছুই বুঝিলেন না। তাঁহার হৃদয় ঘোর অন্ধকারে কালীময় হইয়াছিল, কুম্ভের চেষ্টায় উহা আর আলোকিত হইল না। কুম্ভ নীরব হইলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। জ্যোতির্ম্ময় নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল

তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীর মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন, এবং মুহূর্ত্ত-কাল মধ্যে আপনাদের সৈন্যদল লইয়া 'হরহর' রবে যবন সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল। কুম্ভ দশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া অমিতপরাক্রমে শের শাহের আশী হাজার সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে কিছু মাত্র ভয়ের বিকাশ নাই, উজ্জ্বল মুখ-মণ্ডলে কিছু মাত্র কালিমার সঞ্চার নাই। দুরন্ত যবন তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, পবিত্র বীর-ধর্ম্মের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কুম্ভ আজ অরাতির শোণিতে সেই কলঙ্করেখা মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত, পবিত্র সমরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনন্ত মহিমা-ময় বীরত্ব-কীর্ত্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমুল সংগ্রামে কুম্ভ আপনার লোকাতীত তেজস্বিতার পরি-চয় দিতে লাগিলেন। যবন সৈন্য এ তেজস্বিতার গতি নিরোধ করিতে পারিল না। তাহাদের অনেকে সমরক্ষেত্রে চিরনিদ্রিত হইতে লাগিল। অনেকে শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল। শের শাহ হতাশ হইলেন, চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। রাঠোর-গণের পরাক্রমে তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। ইহার মধ্যে আর এক দল সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ আসিল। কুম্ভ অবিশ্রান্ত শত্রুসেনা বধ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে অভিনব সৈন্যদল তাঁহাকে আক্র-মণ করিল। পরাক্রান্ত রাঠোর বীর ঐ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রণে ভঙ্গ দিয়া ভীরুতার

পরিচয় দিলেন না। তিনি আপনাদের বিশ্বস্ততা দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এখন তুচ্ছ প্রাণের জন্য ঐ প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইলেন না। মরুস্থলীর পুণ্যক্ষেত্রে—শত্রুর ভৈরব কোলাহলমধ্যে তেজস্বী বীরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। কুম্ভ অকাতরে যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্ত ধামে যাইয়া, অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইলেন। আর তাঁহার রাঠোর সেনা সম্মুখ সমরে অরাতি নাশ করিয়া নশ্বর জগতে অমরত্ব লাভ করিল। আর্য্য-কীর্ত্তির অনন্ত মহিমায় আর্য্যাবর্ত্তের মরুস্থলী চিরপবিত্র হইয়া রহিল।

রাঠোরের বীরত্বে শের শাহ চমকিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি মাড়বারের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া ভীতি-ব্যঞ্জক স্বরে কহিয়াছিলেন, "আমি একমুষ্টি ভুট্টার জন্য এখনই ভারতসাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।"

সোমনাথ।

ভারতের ইতিহাসে সোমনাথ চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর নিকটে সোমনাথ চিরপবিত্র। সোমনাথের মন্দির প্রকৃতির অতি রমণীয় প্রদেশে অবস্থিত। গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে—সমুন্নত পর্ব্বতের উপরিভাগে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্মুখে বিশাল অনন্ত সমুদ্র সর্ব্বদা বিশালভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভৈরবরবে পর্ব্বতের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে, যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল নীল বারিরাশি—ফেণিল বারিধি ক্রমে গাঢ় নীল হইয়া অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত মনোহর বৃক্ষলতায় পরি-

শোভিত। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নীচে অনন্ত নীল সমুদ্র, মধ্যভাগে পাদপ-পরিবৃত সুনীল পর্ব্বতে দেবাদিদেব সোমনাথের পবিত্র মন্দির। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা এইরূপ রমণীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। প্রকৃতির এইরূপ গম্ভীর ভাবের মধ্যে শান্তিময় পরমদেব আপনার উপাসকদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি-রস বিকাশ করিতেন।

প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে শিব-মন্দির সমূহ যে ভাবে নির্ম্মিত হইত, সোমনাথের মন্দিরও সেই ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পরিধি ৩৩৬ ফীট, দৈর্ঘ্য ১১৭ ও বিস্তার ৭৪ ফীট। ইউরোপ খণ্ডের মন্দিরের তুলনায় ভারতের এই দেব-মন্দিরটি অবশ্য ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু হিন্দু উপাসকগণ জনতা-প্রিয় ছিলেন না, লোকারণ্যের মধ্যে তাঁহারা শান্তভাবে শান্তিময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা করিতে ভাল বাসিতেন না। নীরবে, নির্জ্জনে তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবের ধ্যান করাই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের উপাস্য দেবের মন্দির তদনুরূপ ভাবেই সংগঠিত হইত। যাঁহারা ইউরোপের উপাসনা-গৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সোমনাথের মন্দির দেখিয়া হিন্দুদিগের ঐ অভ্যন্তরীণ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অবশ্য সমর্থ হইবেন। মন্দিরটি কঙ্করপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে বিবিধ কারুকার্য্য-খচিত এক একটি সুন্দর মণ্ডপ ছিল। মণ্ডপগুলির ভগ্নাবশেষ এখন পরধর্ম্ম-বিদ্বেষী মুসলমানের প্রগাঢ় ধর্ম্মান্ধতার পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি খোদিত থাকাতে উহা

বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছিল। এক অংশে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ প্রকাণ্ড হস্তীর মস্তক ছিল। উহার নাম গজ-গৃহ। অপর অংশে বিভিন্ন বেশে সজ্জিত বিভিন্নভাবে স্থাপিত কতকগুলি অশ্ব রহিয়াছিল, উহার নাম অশ্ব-শালা। অন্য অংশে মণ্ডলীবদ্ধ সুরসুন্দরীগণের নৃত্যাভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহার নাম রাসমণ্ডল। খোদিত মূর্ত্তিগুলি সুগঠিত ও বৃহদাকার। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ মুসলমানগণের অত্যাচারে সকল গুলিই শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। রাসমণ্ডলের সুরসুন্দরীগণের ভগ্ন হস্ত, পদ ও মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া কাণ্ড-জ্ঞান শূন্য মুসলমান আক্রমণকারীর ভীষণ লৌহ-দণ্ডের ভীষণতার পরিচয় দিতেছে।

মধ্যভাগের মণ্ডপটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ মণ্ডপের গুম্বজ আটটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অনেকে অনুমান করেন, মুসলমানেরা হিন্দুদের উপকরণ লইয়া ঐ অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বস্তুত ঐ অংশে মুসলমান-কৃত শিল্পকার্য্যের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের যে অংশে সোমনাথের পবিত্র লিঙ্গমূর্ত্তি ছিল, তাহা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে। সে বিচিত্র কারুকার্য্য, এখন কিছুই নাই, কেবল ভগ্ন প্রস্তর-স্তূপ পরিবর্ত্তনশীল কালের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের এক স্থানে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহ আছে। গৃহটি ২৩ ফীট দীর্ঘ ও ২০ ফীট প্রশস্ত। পুরোহিতগণের নির্জ্জনধ্যানধারণার জন্যই বোধ হয়, উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের পশ্চিম দিকের প্রাচীর মক্কার দিকে থাকাতে মুসলমানেরা ঐ প্রাচীর খুদিয়া মোল্লাদিগের ভজন-স্থান করিয়া দিয়াছে।

একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ উচ্চ খণ্ডে সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার চারি দিক অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পবিত্র মন্দিরে বহুসংখ্য প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি বিভিন্নভাবে স্থাপিত ছিল। অত্যাচারী মুসলমানের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া ঐ মূর্ত্তিগুলি এখন সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কতকগুলি আবার নশ্বর মানবের অস্থায়ী প্রাসাদ বা মন্দিরের দেহ পুষ্ট করিয়াছে। কথিত আছে, জুম্মামসজিদের জন্য মুসলমানেরা এই স্থান হইতে পাঁচটি মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিল।

এখন সোমনাথের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলে সহৃদয় দর্শকের হৃদয় নানারূপ চিন্তার প্রবাহে আন্দোলিত হইতে থাকে। আর্য্যভূমির সৌভাগ্যের সময়ে উহার যে শোভা ও যে গৌরবছিল, এখন তাহার কিছুই নাই। পুণ্যশীলা অহল্যাবাইর যত্নে এই স্থানে একটি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের উপাসকদিগের সন্তানগণ এই দেবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিলুপ্ত গৌরব আর ফিরিয়া আইসে নাই। হিন্দুগণ আপনাদের পবিত্র দেবতার গৌরব রক্ষার জন্য অকাতরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাঁখেন। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের পরাক্রমে নিরস্ত থাকে। শেষে চতুর সুলতান মহমুদ আপনার সৈন্য দল ফিরাইয়া, পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করেন। হিন্দুরা দেখিলেন, দুরন্ত মুসলমান আপনার সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাঁহাদের পবিত্র মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে আমোদ করিতে লাগি-

লেন। সুলতান মহমুদ এই সুযোগে রাত্রি-শেষে জাফর ও মজফ্‌ফর নামক দুই ভ্রাতার অধীনে এক দল সাহসী সৈন্য মন্দির আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয় অলক্ষিত ভাবে দ্বারদেশে আসিয়া পঁহুছিল। বৃহৎকায় হস্তীর পরাক্রমে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ইহার মধ্যে সুলতান মহমুদও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া বিপুলবিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অসময়ে অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলেও রাজপুতবীরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শোণিততরঙ্গিণী অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইল। ক্ষত্রিয়গণ আরাধ্য দেবতার জন্য অকাতরে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সাত শত বীরপুরুষ অসি হস্তে লইয়া মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ উদ্যমও সফল হইল না। ভয়াবহ শোণিত-প্রবাহমধ্যে আর্য্য-বীরপুরুষগণের দেহ-রক্তের সহিত চির পবিত্র আর্য্য-কীর্ত্তির চিহ্ন বিনষ্ট হইয়া গেল।

মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি

শিবজী।

পঞ্চম খণ্ড।

আর্য্য-কীর্ত্তি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

১৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট,—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৬৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,—বীণাযন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২

সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

১৫ পৃষ্ঠায় ১৯ পঙ্ক্তিতে "রমণাতে" স্থলে ''রমণীতে" হইবে।

"আত্মসম্মানে আত্মবিসর্জ্জন" প্রবন্ধের ''ভাইনৃসোর" কথার স্থলে "ভাইনৃস্ত্রোর" পড়িতে হইবে।

আর্য্য-কীর্ত্তি।

স্বাধীনতার প্রকৃত সম্মান।

খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আর্য্যাবর্ত্তের পর দক্ষিণাপথে আপনার প্রভুত্ব-বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী অপূর্ব্ব বীরত্বের গৌরবে, লোকাতীত তেজস্বিতার মহিমায়, আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার প্রতাপ ও তাঁহার মহাপ্রাণতার গৌরবে সমস্ত দক্ষিণাপথ গৌরবান্বিত হইয়াছে। ক্ষমতাশালী মোগল কিছুতেই এই হিন্দুবীরের বীরত্ব-কীর্ত্তি সঙ্কুচিত করিতে পারিতেছেন না। দিনের পর দিন অতীত হইতেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে অনন্ত অসীম কাল-সাগরে মিশিয়া যাইতেছে, কিন্তু স্বাধীনতার উপাসক ভবানী-ভক্ত হিন্দুবীরের প্রতাপ মন্দীভূত হইতেছে না। হিন্দুবীর আপনার বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, মুসলমানের কাছে কিছুতেই অবনতি স্বীকার করিতেছেন না। ঘোর দুর্দ্দিনে, পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে,ধর্ম্মান্ধ মোগলের কঠোর পীড়নে আর্য্যভূমি আবার যেন আর্য্যবীরের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তামসী নিশীথের আকাশ-তলে যেন একটি ধ্রুবতারা

ধীরে ধীরে জ্বলিয়া পথহারা পথিকের হৃদয়ে নিরাশায় আশা, অনাশ্বাসে আশ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে; করাল কাদম্বিনীর পার্শ্বে যেন চিরদীপ্ত প্রভাকর জগজ্জীবনী প্রভা বিকাশ করিয়া জীবলোককে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুলকিত করিতেছে।

আওরঙ্গজেব শিবজীকে বশীভূত করিবার জন্য আপনার মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দক্ষিণাপথের সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শিবজীর ক্ষমতার গতিরোধ হয়, তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার দুর্গ সকল মোগলের অধিকারভুক্ত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবার জন্য এই নব-নিয়োজিত সুবাদারের উপর আদেশ হইল। সম্রাটের আদেশে শায়েস্তা খাঁ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, আওরঙ্গাবাদ হইতে পুনার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুনা অধিকৃত হইল। শিবজী মোগলসৈন্যের আগমন-সংবাদ পাইয়া, রাজগড় ছাড়িয়া, সিংহগড় আপনার প্রধান বাসস্থান করিলেন। এদিকে শায়েস্তা খাঁ পুনা হস্তগত করিয়া এক দল পরাক্রান্ত সৈন্য ঘাটপর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি স্থান অধিকার করিতে পাঠাইলেন। তিনি শিবজীর অধিকৃত জনপদে মোগলের জয়-পতাকা স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সুতরাং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাঁহার তেজস্বিতা বিকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী সুবাদার বিনা বাধায় মহারাষ্ট্র রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। শিবজীর মহামন্ত্রবলে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাহস ও বলসম্পন্ন হইয়াছিল। স্বাধীনতার গৌরবে তাহাদের বীরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, জাতীয় জীবনে তাহাদের একতা সাধিত হইয়াছিল, এবং আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদার মহিমায় তাহাদের দেশ-হিতৈষিতা হৃদয়ে প্রসা-

রিত হইয়াছিল। মোগল সুবাদার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্ত জাতির স্বাধীনতার সম্মান নষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাষ্ট্রে চকন নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। শিবজী ফিরঙ্গজী নামক এক জন যুদ্ধবীরের হস্তে এই জনপদের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। তেজস্বী ফিরঙ্গজী ১৬ বৎসর কাল দুরন্ত মুসলমানের অধিকারের মধ্যে চকনের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। শায়েস্তা খাঁ চকনের আয়তন অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি আদেশ করিবামাত্র এই সঙ্কীর্ণ নগরের শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। কিন্তু ফিরঙ্গজী ক্ষুদ্র জনপদের রক্ষক হইলেও ক্ষমতা ও তেজস্বিতায় ক্ষুদ্র ছিলেন না। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন না, আত্ম-স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিলেন না। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিল, পরাক্রম প্রবল হইল! বীরপ্রবর লোকাতীত বীরত্বের সহিত তেজস্বী মোগল-সৈন্যের সম্মুখে আত্ম-রক্ষায় উদ্যত হইলেন। ক্রমে এক মাস গেল, আর এক মাসেরও অর্দ্ধাংশ অতীত হইল, তথাপি পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মোগলের পদানত হইলেন না। দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, প্রতিদিনে প্রতিসপ্তাহে ফিরঙ্গজী নবীন সাহস, নবীন উদ্যম, নবীন বীরত্বে বিভোর হইয়া স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক মাস পঁচিশ দিন কাটিয়া গেল। চকন শায়েস্তা খাঁর অধিকৃত হইল না। ষড়্‌বিংশ দিনে হঠাৎ নগর-প্রাচীরের এক দিকে একটি কুল্যা ফুটিয়া উঠাতে প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গেল। আক্রমণকারী মোগল-সৈন্য মহোল্লাসে এই ভগ্ন স্থান দিয়া নগর-প্রবেশে উন্মুখ হইল।

এই সঙ্কটকালে সাহসী ফিরঙ্গজী আপন সৈন্যগণের অগ্রভাগে থাকিয়া বিপক্ষের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পরাক্রম—তাঁহার ক্ষমতা—তাঁহার বীরত্ব কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। ফিরঙ্গজী এমন কৌশলে—এমন তেজস্বিতার সহিত বিপক্ষের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিলেন যে,আক্রমণকারী সৈন্যদল কিছু-তেই অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি সমস্ত দিন এইরূপে আত্মরক্ষা করিলেন—এইরূপে সমস্ত দিন নগর-প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে দাঁড়াইয়া, বহুসংখ্য মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে বুক পাতিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতার সহিত মহাবীর শিবজীর মহামন্ত্রের গৌরব রাখিলেন। ক্রমে রাত্রি আসিল, অনন্ত নৈশ গগনে দুই একটি তারকাস্তবক ধীরে ধীরে ফুটিতে লাগিল। রাত্রি-সমাগমে মোগল-সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তেজস্বী ফিরঙ্গজী শায়েস্তা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ এই বীরপুরুষের সমুচিত মর্য্যাদা করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি ফিরঙ্গজীর অসাধারণ সাহস ও ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি তিনি মোগল-সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কিন্তু তেজস্বী ফিরঙ্গজী আত্ম-সম্মান বিক্রয় করিলেন না। তিনি শায়েস্তা খাঁর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। শায়েস্তা খাঁ তাঁহার বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ফিরঙ্গজী বীরত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে,শিবজী তাঁহার সাহস ও ক্ষমতার পুরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতের বীরপুরুষ এক সময়ে এইরূপে

স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আর্য্য-গৌরবে জলাঞ্জলি না দিয়া এক সময়ে এইরূপে তেজস্বিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রে মহাকীর্ত্তি।

আওরঙ্গজেব দক্ষিণাপথে আপনার অধিকার বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন। মহাবীর শিবজী অপূর্ব্ব বীরত্ববলে সম্রাটের পরাক্রম খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহার সাহস বাড়িয়া উঠিয়াছে—উচ্চতর অধ্যবসায়, মহত্তর সাধনা বিকাশ পাইয়াছে। তিনি অতুল সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, অলৌকিক অধ্যবসায়-গুণে স্বর্গাদপি গরীয়সী পুণ্যভূমির স্বাধীনতা-রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গ-প্রবাহ ভৈরব রবে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। শিবজী দক্ষিণাপথে অটল গিরিবরের ন্যায় দাঁড়াইয়া লোকাতীত তেজস্বিতার সহিত সেই তরঙ্গ-প্রবাহের গতি রোধ করিতেছেন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত এইরূপ বীরত্বকীর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে স্বাধীনতার স্বর্গীয় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্তে প্রকাশ পাইয়া লোকের হৃদয়ে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। ঘোর দুর্দ্দিনে মেঘমালার একদেশ হইতে সূর্য্যের অনতিস্ফুট আলোক নিঃসৃত হইয়া অন্ধকারময় স্থান এইরূপ উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আওরঙ্গজেব শিবজীর পরাক্রম খর্ব্ব করিতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মাজ্জম্ ও সেনাপতি যশোবন্ত সিংহকে দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দিয়াছেন। শিবজীর সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ মোগলের হস্তগত হইয়াছে। মোগল-পক্ষের অনেক রাজপুত-সৈন্য সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতেছে। আজ শিবজী এই দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত—মোগলের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৃতহস্ত। বীরশ্রেষ্ঠ আজ এই উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়াছেন—নীরবে গম্ভীরভাবে বিপক্ষের ক্ষমতা নষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন।

সিংহগড় নিসর্গ রাজ্যের গভীর সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। ইহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এক দিকে সহ্যাদ্রি অনন্ত গগনে মাথা তুলিয়া আপনার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্ব প্রান্তে সিংহগড়। উত্তরে ও দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও এইরূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটি ত্রিকোণাকার। উহার মধ্যভাগের পরিধি প্রায় দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে, অনভ্র নীল গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশ পায়, তখন পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীরা নদীর বৃক্ষলতা-পরিশোভিত শ্যামল তটদেশ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে থাকে। উত্তর দিকে—পর্ব্বতের বহিঃপ্রদেশে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। শিবজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুনানগরী এই ক্ষেত্রের

পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত ও অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই অভ্রভেদী গিরির শিখরগুলি সুদূর দিগন্তে —অনন্ত নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই দিকে শিবজীর রায়গড় অবস্থিত। শিবজীর সেনাপতি তন্নজী এই দুর্গম, দুরারোহ গিরি-দুর্গ অধিকার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাঘ মাস। দুর্গম গিরিপ্রদেশে দুরন্ত শীত আপনার দ্বিগুণ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সাহসী তন্নজী এই শীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এক হাজার মাওয়ালী সৈন্য লইয়া সিংহগড় অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। গিরিপথগুলি এই সকল সৈন্যের পরিচিত ছিল। ইহারা গভীর নৈশ অন্ধকারে নির্ভয়ে, নিঃশব্দে এই পরিচিত গিরিপথ দিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী আপনার সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক ভাগ কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহাদের উপর আদেশ ছিল যে, ইহারা আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র অগ্রসর হইবে। অপর ভাগ দুর্গের ঠিক নিম্নে পর্ব্বতের পাদদেশে লুক্কায়িত হইল। ইহাদের মধ্যে একজন সাহসী বীরপুরুষ নিঃশব্দে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বিশেষ সত্বরতার সহিত একগাছি দড়ির মই ফেলিয়া দিল। শিবজীর মাওয়ালী সৈন্য ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এই সোপানমাত্র অবলম্বন করিয়া একে একে উপরে উঠিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত সৈন্য উপরে উঠিয়াছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটি শব্দ হইল। এই শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা যে দিক্ দিয়া মাওয়ালী সৈন্য উপরে উঠিতেছে, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিল। এক জন সৈনিক, ঘটনা কি, জানিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইয়াছে, অমনি এক জন মাওয়ালীর নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইল। কিন্তু এই শব্দে দুর্গরক্ষীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। তন্নজী তখন বিপুল সাহসে তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া সেই বহুসংখ্য দুর্গরক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। মাওয়ালীগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গরক্ষী সৈন্যদিগের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তন্নজী প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় সেই যুদ্ধস্থলে বীর শয্যায় শায়িত হইলেন। তখন মাওয়ালা সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে নীচে নামিবার জন্য দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে তন্নজীর ভ্রাতা সূর্য্যজী যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরস্বরে মাওয়ালীদিগকে কহিলেন, "কোন্ নরাধম আপনার পিতার দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে? দড়ির মই নষ্ট হইয়াছে। সকলে যে, শিবজীর মাওয়ালী-সৈন্য, এখন তাহারই প্রমাণ দেখান উচিত।" সূর্য্যজীর এই তেজস্বিতাময় বাক্য মাওয়ালীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহারা আবার "হর হর মহাদেব" শব্দে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইল। এই গম্ভীর শব্দ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ করিয়া পর্ব্বত-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এবার মাওয়ালীগণ এরূপ বেগে দুর্গরক্ষীদিগকে অক্রমণ করিল যে, তাহারা কিছুতেই এই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। পাঁচ শত দুর্গরক্ষী সাহসী সৈনিক পুরুষ মাওয়ালীদিগের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। সূর্য্যজী বিজয়ী হইলেন। দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরস্থিত সিংহগড়ে আবার শিবজীর বিজয়-পতাকা সুদূর গগনে উড়িতে লাগিল।

এই বিজয়-বার্ত্তা শিবজীর নিকট পঁহুছিল। কিন্তু শিবজী যখন শুনিলেন যে, দুর্গ অধিকার করিতে তন্নজী নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি গভীর শোকে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহিলেন, "সিংহের আবাস-গৃহ অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু সিংহ হত হইল। আমরা দুর্গ হস্তগত করিলাম; কিন্তু হায়! তন্নজীকে জন্মের মত হারাইতে হইল।"

বীরপুরুষের প্রকৃত বীরত্ব।

মোগলসম্রাট আকবরের মৃত্যু হইয়াছে। অপরের প্রাণনাশ করিতে যাইয়া, সমগ্র ভারতের মহিমান্বিত ভূপতি আপনার প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন। অপূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতার অপূর্ব্ব ফল ফলিয়াছে। যিনি সমদর্শিতার বলে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন, দূরদর্শিতার প্রভাবে বিবিধ মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সুরাজ-শক্তির মহিমায় ঈশ্বরপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অপরের সর্ব্বনাশ করিতে যাইয়া, আপনারই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন *। কুমার সলিম, এখন জাহাঁগীর নাম পরিগ্রহ করিয়া, দিল্লীর রত্ন-

* রাজস্থানের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, মহারাজ মানসিংহ, পাছে সলিমের পরিবর্ত্তে খসরুকে রাজ্যাধিপতি করেন, এই আশঙ্কায় সম্রাট আকবর তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন, তাহার কিয়দংশ বিষাক্ত করা হয়। কিন্তু ভুলক্রমে এই বিষাক্ত অংশ মানসিংহকে না দিয়া, আপনিই ভোজন করেন। ইহাতে আকবরের প্রাণ বিয়োগ হয়।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। জাহাঁগীর ভারতের চারি দিকে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার পিতা আকবর, যে বিজয়িনী শক্তিতে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, জাহাঁগীর সে শক্তি সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। পরাক্রান্ত রাজপুত রাজ্য আকবরের প্রধান লক্ষ্য-স্থল ছিল। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ আপনার লোকাতীত বীরত্ব ও লোকাতীত দেশভক্তির বলে দীর্ঘকাল মোগল-সৈন্যের সমক্ষে আত্ম-স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। জাহাঁগীর প্রতাপের এই বীরত্ব—রাজপুতদিগের এই তেজস্বিতার বিষয় ভুলিয়া যান নাই। হলদীঘাটের গিরিসঙ্কটে—সেই পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থে, তিনি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য রাজপুতদিগের আত্মত্যাগ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এখন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া সেই পুণ্যভূমি মিবার, পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে আবার অগ্রসর হইলেন। এ সময়ে মহাবীর প্রতাপসিংহ অক্ষয় স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বীরভূমি প্রতাপের বীরত্ব-মহিমা হইতে স্খলিত হইয়াছিল। দিল্লীর অভিনব সম্রাট এই সুযোগে চিতোরের প্রাচীন দুর্গ হস্তগত করিলেন। চিতোরের অধিপতি দুর্গম পর্ব্বতের বিজন অরণ্যে যাইয়া, আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রাজ্যের সীমান্তভাগে অন্তল নামে একটি দুর্গ ছিল। এ দুর্গেও সম্রাটের আধিপত্য স্থাপিত হইল। কিন্তু পরাক্রান্ত রাজপুতগণ ইহাতে উদ্যমশূন্য হইল না। যে স্বাধীনতার গৌরবে, যে স্থিরপ্রতিজ্ঞার মহিমায়, যে বীর-শক্তির গরিমায় এক সময়ে তাহারা উদ্ভাসিত হইয়াছিল,

সে গৌরব, সে মহিমা ও সে গরিমা এখনও রাজপুতগণ হইতে একবারে অন্তর্হিত হয় নাই। চিতোরের অধিপতি আজ আপনাদের চিরন্তন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, আর রাজপুতনার বীরত্বদৃপ্ত রাজপুতগণ আপনাদের প্রনষ্ট-গৌরবের উদ্ধার-বাসনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন। এই সময়ে রাজপুতনার একটি বীরপুরুষ আপনার লোকাতীত মহা-প্রাণতার পরিচয় দেন, লোকাতীত তেজস্বিতার সহিত আত্ম-ত্যাগ করিয়া নশ্বর জীবলোকে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

রাজপুতনার বীরগণ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে একত্র হইয়াছেন; মিবারের রাণা পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য,এই বীর-গণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। আজ সকলেই আপনাদের বীরত্ব-গৌরব দেখাইতে কৃতহস্ত। তাঁহাদের পবিত্র ভূমিতে শত্রু-গণ প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের দুর্গে শত্রুর পতাকা উড়িতেছে, তাঁহারা শত্রুর আক্রমণে পার্ব্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছেন,আজ সকলেই এই দুরন্ত শত্রুকে সমুচিত প্রতিফল দিতে যত্নশীল। বীরভূমির সাহস-সম্পন্ন. রণকুশল চন্দাবত ও শুক্তাবতগণ * একত্র হইয়াছেন। আজ সকলেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষোচিত তেজস্বিতায় উদ্ভাসিত, সকলেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া রাণার আদেশ-পালনে সমুদ্যত। চন্দাবতগণ যুদ্ধযাত্রী সৈন্যগণের অগ্রগামী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি-

---

*চিতোরের এক জন প্রাচীন রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম চন্দ। ইহাঁর দলস্থগণ চন্দাবত নামে প্রসিদ্ধ। শুক্ত রাণা উদয়সিংহের পুত্র। এই নামে শুক্তাবত দল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

দ্বন্দ্বী শুক্তাবতগণও এই সম্মান পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন, আজ উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীই উভয়ের অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্য আগ্রহান্বিত, উভয়েই উভয়ের অগ্রে যাইয়া আত্ম-প্রাধান্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উভয় দলই আপনাদের তরবারির উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু রাণা কৌশলক্রমে এই আত্মবিগ্রহের গতি রোধ করিলেন। তিনি ধীর-গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "যিনি শক্রর অধিকৃত অন্তল দুর্গে অগ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাঁহারই, সৈন্য-দলের অগ্রে যাওয়ার সম্মান লাভ হইবে।" চন্দাবত ও শুক্তাবতগণ রাণার আদেশে এই গৌরবান্বিত সম্মান পাইবার আশায় বিপুল উৎসাহ-সহকারে অন্তল দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অন্তল মিবারের একটি সমধরাতলবর্ত্তী দুর্গ। উহা রাজ্যের সীমান্তভাগে অবস্থিত এবং রাজধানী হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরবর্ত্তী। দুর্গটি উন্নত ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। একটি স্রোতস্বতী উহার প্রাচীরের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীর অতি দৃঢ় ও উন্নত—উহা বিশালভাবে অসীম নভোমণ্ডলে প্রসারিত হইয়া আপনার বিশালতার পরিচয় দিতেছে। দুর্গে যাইবার জন্য কেবল একটি মাত্র পথ। এই পথ দুর্গের লৌহকীলকময় সুদৃঢ় সিংহদ্বারে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

চন্দাবত ও শুক্তাবতগণ গভীর নিশীথের শান্তিভঙ্গ না হইতেই, আত্ম-প্রাধান্য অব্যাহত রাখার আশায়, এই দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চারণগণ মধুর কণ্ঠে তেজস্বিতার উদ্দীপক সঙ্গীতে উভয় দলের তেজস্বিতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই সঙ্গীত যুদ্ধযাত্রীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। উভয় দল, এই

বিজয়িনী গীতিকায় উৎসাহযুক্ত হইয়া বীরদর্পে বিভিন্নপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রভাতসময়ে শুক্তাবতগণ দুর্গদ্বারের নিকট উপনীত হইলেন। এই সময়ে শত্রুগণ নিরস্ত্র ছিল, কিন্তু তাহারা আক্রমণ-সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দুর্গ-প্রাচীরে দাঁড়াইল। রাজপুতগণ প্রবল বেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন; মোগল সৈন্যও দৃঢ়তার সহিত এই আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। এদিকে চন্দাবতগণ জলাভূমি পার হইয়া দুর্গের অভিমুখে আসিতেছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে উঠিবার আশায় তাঁহারা কতকগুলি মই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। শুক্তাবতদলের অধিনায়ক ইহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে মই ছিল না, সুতরাং তিনি দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অগ্রেই দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এদিকে শত্রুর গোলার আঘাতে চন্দাবতদলের অধিনায়ক পড়িয়া গেলেন। মোগল সৈন্য উভয় দলকেই সমান ভাবে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু শুক্তাবতদিগের তেজস্বী অধিনায়ক নিরস্ত হইলেন না। তিনি যে হস্তীতে ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই দ্বার সুতীক্ষ্ণ লৌহময় শলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল, সুতরাং হস্তী আপনার বলপ্রকাশের সুবিধা পাইল না। সাহসী শুক্তাবত ইহা দেখিয়া হাওদা হইতে নামিলেন, এবং ধীরপ্রশান্তভাবে সেই তীক্ষ্ণ লৌহশলাকাময় দ্বারে বক্ষঃস্থল পাতিয়া মাহুতকে আপনার পৃষ্ঠদেশে হাতী চালাইতে কহিলেন। মাহুত অধিনায়কের আদেশ প্রতিপালন করিল। হস্তী তেজস্বী শুক্তাবতের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া দিল। বীরপুরুষ আত্ম-

প্রাধান্য রক্ষার জন্য ধীরভাবে লৌহশলাকায় বুক পাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বীর-শ্রেষ্ঠের এই অক্ষয় অনন্ত বীরত্ব-কীর্ত্তিতে রাজপুতের পবিত্র ভূমি পবিত্রতর হইল।

কিন্তু শুক্তাবতগণ আপনাদের অধিনায়কের এই লোকাতীত তেজস্বিতাতেও অভীষ্ট সম্মান লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা অধিনায়কের মৃত দেহের উপর দিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে চন্দাবতদলের অধিনায়ক নিহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর এক জন সাহসী ব্যক্তি এই দলের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নিহত অধিনায়কের দেহ পৃষ্ঠদেশে বান্ধিয়া বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইলেন, এবং হস্তস্থিত শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া, পৃষ্ঠস্থিত অধিনায়কের মৃত দেহ দুর্গের মধ্যে ফেলিয়া ভৈরব রবে কহিলেন,"চন্দাবত অগ্রে অন্তল দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং তিনিই যুদ্ধ-যাত্রী সৈন্য-দলের অগ্রণী।"

বীরাঙ্গনার বীরত্ব-মহিমা।

মোগল সম্রাট আকবর শাহ দিল্লীর শাসন-দণ্ড পরিগ্রহ করিয়াছেন। ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে মোগলের বিজয়-পতাকা বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া, যেন বিপক্ষদিগকে তর্জ্জনা করিতেছে। যে সকল সামন্ত দিল্লীর অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন। সম্রাট আকবর আপনার বাহুবলে ও আপনার

মন্ত্র-কৌশলে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিপুল বৈভবে, সুশাসনের গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের শ্যামল প্রান্তরে, দক্ষিণাপথের প্রশস্ত ক্ষেত্রে, আফগান-ভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে, তাঁহার গৌরব-কাহিনী উদ্ঘোষিত হইতেছে। জনসাধারণ তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার প্রাধান্য, তাঁহার অলোক-সাধারণ গুণ-গরিমা দেখিয়া মহতী দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

অদ্য আকবর শাহের খোষ্‌রোজ। বিশাল রাজপুরীতে সুন্দর বাজার বসিয়াছে। এ বাজারে পুরুষের সমাগম নাই; কেবল কমনীয় কামিনীকুল সারি সারি দোকান সাজাইয়া চারি দিকে অপূর্ব্ব শোভার বিস্তার করিয়াছে। সম্রাট-পত্নী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, সামন্ত-ললনাগণ হাসিতে হাসিতে বাজারের চারি দিকে বেড়াইতেছেন। রাজপুত কামিনীগণ সুদৃশ্য বেশভূষায় পরিশোভিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছেন। নানা স্থানে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোমদ, যাহা কিছু তৃপ্তিপ্রদ শিল্প দ্রব্য আছে, সমস্তই এই রমণীর রমণীয় বাজারে সজ্জিত হইয়াছে। রমণীই এই সকল অপূর্ব্ব শিল্প-দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-কারিণী—

"রমণীতে বেচে, রমণীতে কিনে,
লেগেছে রমণী-রূপের হাট।"

লাবণ্যবতী ললনাগণে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটের পুরী আজ এইরূপ পরিপূর্ণ। শিল্পচাতুরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে—কামিনীর অপূর্ব্ব কমনীয় কান্তিতে আজ রাজভবন এইরূপ উদ্ভাসিত। সম্রাট্‌ ছদ্মবেশে এই রূপবতীকুলের বাজারে বেড়াইতেছেন।

মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার নয়ন-যুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কামিনীগণের সৌন্দর্য্য-গরিমা ও কামিনীগণের ক্রয় বিক্রয় দেখিয়া, আমোদিত হইতেছেন। বিধাতার সৃষ্টি-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ললনাকুসুমে তাঁহার প্রাসাদ সুশোভিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে এক দোকান হইতে আর এক দোকানে যাইতেছেন, এবং প্রতি দোকানেই কোন না কোন দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ক্রয়কারিণী রমণী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিতেছে, সম্রাট স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া সেই দ্রব্য কিনিয়া লইতেছেন। রমণী আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া স্বর্ণ-মুদ্রা তুলিয়া লইতেছে। বিকশিত কমলদলের প্রশান্ত কান্তিতে বাজার এইরূপ বিভাসিত হইয়াছে। আকবর শাহ সুখের আবেশে এই কমলবনে বিচরণ করিতেছেন। মাসের নবম দিনে এই বাজার হইত। এজন্য ইহা "নওরোজা" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আকবর এই বাজারের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। তিনি আদর করিয়া ইহার নাম "খোষরোজ" বা আমোদের দিন রাখিয়াছিলেন। সম্রাট্ আজ আপনার প্রতিষ্ঠিত এই আমোদের দিনে অনন্ত আমোদের তরঙ্গে দুলিয়া বেড়াইতেছেন।

একটি রূপবতী যুবতী এই বাজার দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য-গরিমায়—তাঁহার স্থিরগম্ভীরভাবে স্তম্ভিত হইয়া, বাজারের রমণীকুল তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। যুবতীর স্থির বিদ্যুৎপ্রভায় সমস্ত বাজারে যেন এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। যুবতী ধীরপদবিক্ষেপে দোকানে দোকানে যাইয়া সমস্ত দেখিতেছেন। সুসজ্জিত দ্রব্যের শিল্প-চাতুরী দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদ জন্মিতেছে বটে, কিন্তু তিনি ক্রয়-

বিক্রয়কারিণী কোন কোন রমণীর লজ্জাহীনতায় মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেছেন। এই ললনা-কুল হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে, কিন্তু সে হাসিতে শীলতার আবেশ নাই, সুতরাং সে হাসি শীলতাময়ী যুবতীর হৃদয়ে আমোদের তরঙ্গ তুলিয়া দিতে পারিতেছে না। যুবতী, সুন্দরীগণের মধ্যে শীলতার এইরূপ ব্যতিক্রমে—পবিত্র সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় অবলম্ব লজ্জার এইরূপ অপব্যবহারে ক্ষুণ্ন হইয়া বাজার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যতা হইয়াছেন। সম্রাট কিয়ৎক্ষণ অনিমিষনেত্রে এই লাবণ্যবতী ললনাকে দেখিলেন। স্থিরসৌদামিনীর অপূর্ব্ব কান্তিতে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। যুবতী বাজার হইতে বাহির হইলেন। নির্গমনের পথ অতি কুটিল। যুবতী সেই কুটিল পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, সম্রাট আকবর শাহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সম্রাট যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার গমন-পথ নিরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইহাতে পবিত্র-স্বভাবা কুলমহিলার অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার হইল। অসময়ে অতর্কিতভাবে ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতিকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। ক্রোধের আবেগে তাঁহার আরক্ত লোচনদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার অঙ্গাবরণ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি বাহির করিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তরবারি সম্রাটের বক্ষঃস্থলের দিকে ধরিয়া আত্মসম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যুবতী এইরূপে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া নিদারুণ অস্ত্র ধরিয়া

গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “যে নরাধম পবিত্র ক্ষত্রিয়-কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হয়, তাঁহাকে এই অস্ত্রদ্বারা সমুচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত।” সম্রাট, লাবণ্যবতী ললনার এইরূপ ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আর কোন রূপ দুঃশীলতা বা উদ্ধত ভাবের পরিচয় দিলেন না। বীরাঙ্গনার এই বীরত্বে ও তেজস্বিতায় তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। গুণ-পক্ষপাতী সম্রাট্ গুণের অমর্য্যাদা করিলেন না। তিনি সৌম্য-ভাবে প্রভূত সম্মানের সহিত তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়-মহিলাকে বিদায় দিলেন।

এই বীরনারী বীরপ্রসবিনী মিবার-ভূমির শুক্তাবতবংশের স্থাপয়িতার দুহিতা এবং রাঠোর-কুল-সম্ভূত সাহসী পৃথ্বীরাজের বনিতা। লোক-প্রসিদ্ধ—ইতিহাসের আদরণীয় সম্রাট্ আকবর এক সময়ে এই লাবণ্যবতী বীরাঙ্গনাকে কলঙ্কিত করিতে এইরূপ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যিনি প্রশান্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সুনিয়মে প্রজারঞ্জন-গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, অবিকারচিত্তে ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষায় সংযত ছিলেন, অলৌকিক ক্ষমতার মহিমায় সাধারণের সমক্ষে দেব-ভাবে সম্পূজিত হইয়াছিলেন, তিনিও এক সময়ে এই রূপ কুপ্রবৃত্তির পথে পদার্পণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। চির-প্রসিদ্ধ রাজপুতনার রাজমহিলা এই পুরুষসিংহের সমক্ষে অসীম তেজস্বিতা দেখাইয়া আপনার বংশোচিত গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি পবিত্রতাময় প্রফুল্ল কুসুম আপনার গৌরবের মহিমায় এইরূপ অকলঙ্কিত রহিয়াছিল।

আত্মসম্মানে আত্মবিসর্জ্জন।

ভাইন্‌সোর চিরপ্রসিদ্ধ মিবারের একটি অধীন জনপদ। মিবারের সামন্ত রাজগণ এই স্থানের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ভাইন্‌সোর দুর্গের এক দিকে উন্নত পর্ব্বত-মালা আকাশ ভেদ করিয়া অনুপম প্রাকৃতিক শোভার পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বতের পাদ-দেশে চম্বল নদ স্রোতের আবেগে তরঙ্গ-ভঙ্গী বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে। দুর্গ হইতে প্রকৃতি রাজ্যের এই রমণীয় দৃশ্য দেখিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়। ভাইন্‌সোরের পশ্চিমে ব্রাহ্মণী নদী খরতর বেগে পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত হইতেছে। স্রোতস্বতীর প্রবাহ শৈলমালায় প্রতিহত হইয়া ভয়ঙ্কর তরঙ্গাবর্ত্তের উৎপত্তি করিতেছে। এই নিসর্গ-সুন্দর জনপদে এক সময়ে প্রমরাবংশীয় এক জন রাজপুত-শ্রেষ্ঠ আধিপত্য করিতেছিলেন। বেইগু জনপদের মেঘাবর্তবংশীয় এক জন ক্ষত্রিয়-সন্তানের দুহিতা, প্রমরাকুলোদ্ভব ভাইন্‌সোর-রাজের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিবাহের পর এই দম্পতীর মধ্যে সহসা কোন রূপ বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই। উভয়েই ভাইন্‌সোরের সেই রমণীয় প্রাসাদে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। অদূরবর্ত্তী গিরিবরের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে উভয়েই পরিতৃপ্ত হইতেন। পর্ব্বত-পার্শ্বস্থিত স্রোতস্বতীর স্রোত-গরিমা উভয়কেই সমভাবে আনন্দিত করিত। এই বিশ্বসংসারে উভয়েই উভয়কে আপনার ভাবিতেন। পবিত্র প্রণয়ে—অপার্থিব ভালবাসায় উভয়েই একসূত্রে গ্রথিত ছিলেন।

এই ভালবাসায় বিভোর হইয়া, দম্পতী একদা ভাইন্‌সোরের প্রাসাদে পঁচিশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উভয়েই আমোদের তরঙ্গে দোলায়মান, উভয়েই উভয়কে হারাইবার জন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত খেলিতেছেন। জয়শ্রী এক বার নায়কের, পরক্ষণে নায়িকার হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও আহ্লাদের সূত্রপাত করিতেছে। একবার ভ্রমরাপত্নী সগর্ব্বে ঈষৎ হাসিয়া পতিকে আপনার ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাইতেছেন, আর একবার ভ্রমরারাজ প্রণয়িনীর সেই ক্রীড়া-গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে হাসিতে হাসিতে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এইরূপ পঁচিশা ক্রীড়া-কৌতুকে দম্পতী ভাইনৃসোরের দুর্গে অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে এই অনন্ত সুখের প্রস্রবণ হইতে তীব্র হলাহলের উৎপত্তি হইল। ভালবাসার খেলায় বিদ্বেষ স্থান পরিগ্রহ করিল। ক্রীড়ার আমোদ ঘোর অসুখ-জনক বাগ্‌-বিতণ্ডায় পরিণত হইল। ভাইনৃসোর-রাজ ক্রোধের আবেগে আপনার শ্বশুর-কুল লক্ষ্য করিয়া একটি গ্লানি-কর কথা কহিলেন। তেজস্বিনী রাজপুত-দুহিতা পিতৃকুলের এ গ্লানি সহিতে পরিলেন না। তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিল; কমনীয় হৃদয় জ্বালাময়ী প্রতিহিংসায় অধীর হইল। তিনি পিতৃকুলের অবমন্তা—ভাল-বাসার—আদরের ধনকে ঘোরতর বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। এ অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ দিতে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। মর্ম্মাহতা ভ্রমরাপত্নী পরদিন বেইও জনপদে দূত পাঠাইয়া পিতাকে এই অপমানের বিষয় জানাইলেন।

বেইগু-রাজ দূতমুখে পবিত্রবংশের নিন্দাবাদ শুনিয়া সক্রোধে জামাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈন্যগণ রাজধানীতে সমবেত হইল। বেইগুর অধিপতি এই সৈন্যদল লইয়া, অরণ্য অতিবাহন করিয়া, ভাইন্‌-সোরের কয়েক ক্রোশ দূরে উপনীত হইলেন। এই স্থলে সৈন্যদল দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বেইগু রাজ্যাধিপতি এক দল লইয়া কুটিল গিরিপথ দিয়া আসিতে লাগিলেন। বেইগু-রাজ-পুত্র আর এক দলের অধিনেতা হইয়া ব্রাহ্মণী নদীর তটদেশ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই শেষোক্ত দল অগ্রে ভাইন্‌সোরে উপনীত হইল। বেইগুরাজ-পুত্র নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, ভাইন্‌সোর-পতির সমক্ষে আসিলেন। প্রমরারাজ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনিও তরবারি লইয়া দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধে বেইগুরাজ-পুত্র বিজয়ী হইলেন। পিতার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তিনি পিতৃকুলের অবমাননা-কারীকে নিহত করিয়া, দুরন্ত প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করিলেন।

সকল শেষ হইল। গতাসু পতির দেহ-নিঃসৃত রুধির-স্রোতে তেজস্বিনী প্রমরা-পত্নীর সমস্ত বিদ্বেষ—সমস্ত ক্রোধের চিহ্ন মুছিয়া গেল। এখন তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে আবার সেই পতিপ্রেম, পতির প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইল। বীরনারী পতির সহগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইলেন। বেইগু-রাজ দুহিতার এ অভিপ্রায়ে বাধা দিলেন না। ব্রাহ্মণী ও চম্বলের সঙ্গমস্থলে চিতা সজ্জিত হইল। রাজপুতবালা প্রফুল্লহৃদয়ে মৃত পতির পার্শ্বে শয়ন করিলে বেইগু-রাজ স্বহস্তে সেই চিতা প্রজ্বালিত

করিলেন। দেখিতে দেখিতে ভ্রমরা-রাজের সহিত ভ্রমরা-পত্নীর প্রফুল্ল কমলদলের ন্যায় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়নারী এইরূপ কঠোর ভাবে অপমানের প্রতিশোধ লইয়া, শেষে প্রশান্ত ভাবে পরলোকে পতির অনুগমন করিলেন।

বীরনারী।

খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখাইতে বিশ্বসংসারে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিপতিগণের আধিপত্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়াছে। লোদীবংশীয় রাজাদিগের পর মোগলবংশীয় রাজগণ ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। পঞ্জাব হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত মোগলের জয়-পতাকা উড়িতেছে। বঙ্গে, গুজরাটে, মধ্য ভারতবর্ষে মুসলমানের আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছে। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহের পরলোক প্রাপ্তির পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা পরিবর্ত্তনশীল সময়ের স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে—পরাধীনতা পরপীড়নের এই দুঃখাবহ সময়ে একটি বীরনারী আপনার অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখাইয়াছিলেন। শত্রুবেষ্টিত পুরীতে, শত্রুর সম্মুখে অকাতরে অবলীলায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আত্মস্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

গুজরাটে হিন্দুরাজত্বের উচ্ছেদ হইলে মুসলমান আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। যখন হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গুজরাটের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। খ্রীঃ ১৫২৮ অব্দে বাহাদুর বেরারের মুসলমান অধিপতির সাহায্যার্থ অহমদনগরের অধিপতি নিজাম শাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রায় বিশেষ কোন ফল-লাভ হয় নাই। অহমদনগরের অধিপতি নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যে আপনার স্বাধীনতা সর্ব্বাংশে অব্যাহত রাখিয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ইহার দুই বৎসর পরে খ্রীঃ ১৫৩১ অব্দে খন্দেসে বাহাদুর শাহের সহিত নিজাম শাহের সাক্ষাৎ হয়। এ বার বাহাদুর নিজামের সম্মান রক্ষা করেন। বাহাদুরের সম্মুখে নিজাম শাহ রাজকীয় উপাধিতে গৌরবান্বিত হন। এই সময়ে রাইসিন দুর্গ হিন্দু ভূপতির অধিকৃত ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ শিহ্লাদি এই দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। মুসলমান রাজা হিন্দু ভূপতিকে আক্রমণ করেন। শিহ্লাদি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হওয়াতে মুসলমানের বন্দী হন। শিহ্লাদির ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া জ্যেষ্ঠের বিমুক্তির জন্য,দুর্গ মুসলমান আক্রমণকারীর হস্তে সমর্পণ করেন। মুসলমানের কথায় লক্ষ্মণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, দুর্গ ছাড়িয়া দিলেই শিহ্লাদি মুক্তি লাভ করিবেন। মুসলমান ভূপতিও লক্ষ্মণের নিকট এ বিষয়ে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসে —এই অঙ্গীকারে আশ্বস্ত হইয়া, লক্ষ্মণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তেজস্বিতার সহিত আত্মরক্ষা করিয়া ক্ষত্রোচিত গৌরব দেখাইলেন না। দুর্গ মুসলমানের হস্তগত হইল। মুসলমান দুর্গে

প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। তাহা-দের অঙ্গীকার, তাহাদের প্রতিশ্রুতি, সমস্তই তখন কলঙ্কের অতল অনন্ত সাগরে ডুবিয়া গেল। তাহারা ভৈরব রবে অগ্র-সর হইয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দুর্গবাসীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় মহাবীর পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতীর তীরে মহাসংগ্রামে বীরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন। বিশ্বাস-ঘাতকায় দিল্লীর রত্ন-সিংহাসন হিন্দু ভূপতির হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে। আজ বিশ্বাসঘাতকায় হিন্দুর অধিকৃত রাইসিন দুর্গ, হিন্দু-নর-নারীর শোণিতে রঞ্জিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ এই আকস্মিক উপদ্রব দর্শনে বিস্মিত হইয়া, মহিলাদিগকে স্থানান্তরিত করি-বার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শিহ্লাদির বনিতা তেজ-স্বিনী দুর্গাবতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। লক্ষ্মণকে দেখি-য়াই দুর্গাবতীর ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত হইল। ললাটরেখা বিস্ফারিত হইয়া কমনীয়তার মধ্যে অপূর্ব্ব তীব্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। লাবণ্যবতী নারী ক্রোধের আবেগে—ঘৃণা ও বিরাগের আবেশে অধীর হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—"এই দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। তুমি এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ অবলীলায় শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছ। শত্রুর সহিত যুদ্ধ না করাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইয়াছে। যে এইরূপে আত্মসম্মানে জলা-ঞ্জলি দেয়, তুচ্ছ প্রাণ রক্ষার জন্য নীচতার সহিত শত্রুর পদানত হয়, আপনার চিরন্তন বংশগৌরব অনায়াসে কলঙ্কিত করিয়া তুলে, সেই ভীরু, নীচাশয়, কাপুরুষকে ধিক্!" তেজস্বিনী দুর্গা-বতী ইহা কহিয়া আপনার প্রাসাদে আগুন দিলেন। দেখিতে

দেখিতে করাল অনল-শিখা গগনস্পর্শী হইল। দুর্গাবতী অম্লান-বদনে অবিকারচিত্তে সাত শত পুরনারীর সহিত সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, আপনার লোকাতীত তেজস্বিতার পরিচয় দিলেন। প্রজ্বলিত হুতাশনে তাঁহার লাবণ্যময় কমনীয় দেহ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। এই ঘটনায় শিহ্লাদি ও লক্ষ্মণের প্রাণে আঘাত লাগিল। তাঁহারা এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। লজ্জার সহিত তাঁহাদের মনে অপরিসীম ঘৃণা ও বিরাগের সঞ্চার হইল। তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তরবারি হস্তে করিয়া কতিপয় সাহসী অনুচরের সহিত দুর্গরক্ষকদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সমুদয় শেষ হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সকলেই সেই দুর্ভেদ্য রাইসিন দুর্গে মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মুসলমান ভূপতি দুর্গ অধিকার করিলেও দুর্গের গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। বীরনারী দুর্গাবতীর অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তিতে রাইসিন ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিল।

রমণী-শৌর্য্য।

খ্রীঃ ১৪৭৪ অব্দে রায়মল মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বে ও পবিত্র চরিত্রের বলে এই রাজপুত ভূপতি রাজস্থানের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সংগ্রামসিংহ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল নামে ইঁহার তিনটি পুত্র ছিল।

আপনার উদ্ধত প্রকৃতির জন্য পৃথ্বীরাজ পিতার আদেশে দেশান্তরিত হন। অপর দুইটি পুত্র পিতার নিকটে ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরে সর্ব্বকনিষ্ঠটির আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। জয়মল ক্ষত্রকুলের অগৌরব-কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হওয়াতে এক জন তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের অসির আঘাতে জীবনলীলা সম্বরণ করেন।

শোলাঙ্কীবংশীয় রাও সুরতনের অস্ত্রাঘাতে জয়মল নিহত হইয়াছেন। অবৈধ উপায়ে পবিত্র রাজস্থান-কুসুম সুন্দরী তারা-বাইর পাণি-গ্রহণে উদ্যত হওয়াতে তাঁহার এইরূপ শাস্তি হইয়াছে। পরাক্রান্ত রায়মল ক্ষত্রকুল-কলঙ্ক পুত্রের হত্যা-কারীকে সমুচিত পারিতোষিক দিয়াছেন। সুরতন মিবারের অধি-পতির পুত্রকে বধ করিয়া, রাজপ্রসাদস্বরূপ বেদনোর জনপদ লাভ করিয়াছেন*। ক্রমে এই কথা চারি দিকে প্রচারিত হইল। ক্রমে চারণগণ এই অপূর্ব্ব কাহিনী সুমধুর গীতিকায় নিবদ্ধ করিয়া,নানা স্থানে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমে পৃথ্বীরাজ এই কথা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে বিষয় লাভ করিতে যাইয়া, প্রাণ হারাইয়াছেন, তিনি এখন সেই বিষয় অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। পৃথ্বীরাজ বেদনোরে আসিয়া রাও সুরতনের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি টোডা অধি-কার করিয়া রাও সুরতনকে উহার আধিপত্য দিবেন। যদি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হয়, যদি তাঁহার বাহুবলে পাঠানেরা পরাজয় স্বীকার না করে, তাহা হইলে তিনি কখনও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না।

* প্রথম খণ্ড আর্য্যকীর্ত্তির ৫-৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

তেজস্বিনী তারাবাই তেজস্বী পৃথ্বীরাজের অসাধারণ সাহস ও পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন। এখন সেই অসাধারণ সাহসী ও পরাক্রমশালী যুবককে উপস্থিত দেখিয়া, তারাবাই তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। তারাবাই পিতার অনুমতি লইয়া পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে যাইতে উদ্যতা হইলেন।

মহরমের দিন। ধর্ম্মরত মুসলমানগণ সংযতভাবে আপনাদের ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দলবদ্ধ মুসলমানের শোক-সঙ্গীত চারি দিকে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ, এই দিনে তারাবাই ও পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। সকলে টোডায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মহরমের তাজিয়া চকে সন্নিবেশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজ অশ্বারোহী সৈন্যদল দূরে রাখিয়া তারাবাই ও আপনার চিরসহচর সেনগড়াধিপতিকে সঙ্গে লইয়া সেই তাজিয়ার সমভিব্যাহারী লোকদিগের সঙ্গে মিশিলেন। এই সময়ে তাজিয়া পাঠানরাজ লিল্লার প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। লিল্লা, তাজিয়ার সঙ্গে যাইবার জন্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন। সহসা তিনটি অপরিচিত অশ্বারোহীকে তাজিয়ার সমভিব্যাহারী লোকের মধ্যে দেখিয়া, তিনি যেমন তাঁহাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অমনি পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইর নিক্ষিপ্ত বাণ তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। পাঠানরাজ বিচেতন হইয়া প্রাসাদ-তলে পড়িয়া গেলেন। আর তাঁহার চেতনা হইল না। এই আকস্মিক ব্যাপার দর্শনে সমবেত পাঠানেরা ভীত হইয়া, কোলাহল করিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে বীরপুরুষ-যুগল

ও বীরবালা অশ্বারোহণে তড়িদ্বেগে নগর-দ্বারে উপনীত হই-লেন। এই স্থানে একটি প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহাদের নির্গমন-পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তেজস্বিনী তারাবাই কিছুমাত্র কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলেন না। তিনি বিপুল সাহসে আপনার তরবারি দ্বারা হস্তীর শুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হস্তী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পলায়ন করিল। বীরবালার অসাধারণ বীরত্বে নির্গমন-দ্বার বিমুক্ত হইল। সকলে অগ্রসর হইয়া আপনাদের অশ্বারোহী সৈন্যগণের সহিত মিশিলেন।

অবিলম্বে আফগানেরা দলবদ্ধ হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহারা রাজপুত সৈন্যের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তারাবাই এই যুদ্ধে পরাক্রমের একশেষ দেখাইলেন। তিনি অশ্বারোহণে বিদ্যুদ্বেগে বিপক্ষ-দলে প্রবেশ করিয়া, আপনার শত্রুসংহারিণী শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই মহাশক্তিতে পাঠানেরা পরাজিত হইল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইল। টোডায় পুনর্ব্বার রাজ-পুতের বিজয় পতাকা উড়িতে লাগিল। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। পৃথ্বীরাজ, রাও সুরতনকে টোডার আধিপত্য দিলেন। সুরতন আপনার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি যথাবিধানে তারাবাইকে পৃথ্বীরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুন্দরে সুন্দরে মিলন হইল। তেজস্বিনী বালা তেজস্বী বীরপুরুষের সহধর্ম্মিণী হইয়া পবিত্র রাজস্থানের গৌরব বাড়াইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ মিবারে আসিয়া নবপরিণীতা বনিতার সহিত

কমলমীর-প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলন। তিনি ইহার পর অনেক স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে তারাবাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে কাতর হন নাই। বীর-রমণী সর্ব্বদা আপনার তেজস্বিতা দেখাইয়া বীরভূমি মিবারের গৌরব রক্ষা করিতেন। কিন্তু দম্পতী দীর্ঘকাল এ নশ্বর সংসারে একত্র থাকিতে পারিলেন না। দুরন্ত শত্রু ইঁহাদের পার্থিব সুখের ব্যাঘাত জন্মাইল। সিরোহীরাজ প্রভুরাওর সহিত পৃথ্বীরাজের ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। সিরোহীপতি স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। এজন্য পৃথ্বীরাজ সিরোহীতে যাইয়া, প্রভুরাওকে শাসন করেন। ক্ষত্র-কুলাঙ্গার প্রভুরাও এই অপমানের প্রতিশোধজন্য আপনাদের চিরন্তন পবিত্র ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি স্বয়ং বিষমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিলেন। বিদায়-সময়ে পৃথ্বীরাজের হস্তে সেই খাদ্যসামগ্রী সমর্পিত হইল। পৃথ্বীরাজ দুরন্ত চক্রীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই হলাহলময় খাদ্য লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দূর হইতে কমলমীর-প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পৃথ্বীরাজ আহ্লাদের সহিত সেই বিষমিশ্রিত সামগ্রী ভোজন করিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবশ হইল। মামাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিয়া তিনি আর চলিতে পারিলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, তীব্র হলাহলে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়াছে। মৃত্যু নিকট জানিয়া, পৃথ্বীরাজ প্রণয়িনীর কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু তারাবাইর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইল। তারাবাই আসিয়া দেখিলেন, প্রিয়তম স্বামী ইহলোক হইতে

অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত পরলোকে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অবিলম্বে চিতা সজ্জিত হইল। পতি-প্রাণা রমণী সেই ভবানী মামাদেবীর পবিত্র মন্দিরের নিকটে আপনার আদরের ধনকে পার্শ্বে রাখিয়া ধীরভাবে জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

দেওয়ীরের যুদ্ধ।

মিবারের অদ্বিতীয় বীর—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় উপাসক প্রতাপসিংহ ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তি-কাহিনী রাজস্থানের নানা স্থানে ঘোষিত হইতেছে। রাজপুতগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া, পবিত্র ভক্তি ও প্রীতিময়ী শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন, অবলীলায় দুঃসহ কষ্ট সহিয়া, আপনার মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন; অমরসিংহ বাল্যকাল হইতেই পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, এই-রূপ কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎ-সর, তখন হইতেই তিনি দুঃখে, বিপদে, পরিশ্রমে, পিতৃসহচর হন। পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত অমরসিংহ এইরূপ নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। নানা বিপদে পড়িয়া, তিনি অনলস, উদ্‌যোগী ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের অসম সাহস ও স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তাঁহার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, স্বাধীনতা-স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল,

এবং রাজপুতের কঠোর ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। প্রতাপসিংহ ভাবিয়াছিলেন, অমরসিংহ সৌখীন যুবক, রাজ্যরক্ষার ক্লেশ তাহার সহ্য হইবে না। এই জন্য তিনি মৃত্যুসময়ে আপনার আবাস-কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন, "হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" আসন্ন-মৃত্যু পিতার এই বাক্য অমরসিংহের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। অমরসিংহ মিবারের সিংহাসন গ্রহণ করিয়া, প্রকৃত রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

মিবারের সর্ব্বপ্রধান বৈরী আকবর, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর প্রায় আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আর মিবার আক্রমণ করেন নাই, তাঁহার মনোযোগ অন্য দিকে গিয়াছিল। তিনি এই আট বৎসর কাল আপনার বিশাল সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নবান্ ছিলেন। সুতরাং অমরসিংহকে পিতৃ-বৈরীর বিরুদ্ধে কোনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। মিবারে শান্তি বিরাজিত ছিল। অমরসিংহ এই শান্তিময় রাজ্যে শান্ত-ভাবে রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছিলেন। তিনি আপনার অধিকৃত জনপদে শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন ও ভূমির কর-নির্দ্ধারণের অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করেন, এবং পেশলাহ্রদের তট-ভূমি একটি সুদৃশ্য প্রস্তরময় অট্টালিকায় সুশোভিত করিয়া তুলেন। এই অট্টালিকা 'অমরমহল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্যে আজ পর্য্যন্ত অমরমহল রাজস্থানের অনন্ত গৌরব বিস্তার করিতেছে।

কিন্তু অমরসিংহ দীর্ঘকাল শান্তি-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। মিবার আবার দুরন্ত মোগলের জিগীষাবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। আকবরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জাহাঁগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। চারি বৎসর কাল তাঁহাকে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিবারণে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পর-রাজ্যজয়ে মনোযোগী হন। আর্য্যাবর্ত্তের সকল জনপদই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সকল জনপদের অধিস্বামীগণ তাঁহাকে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। কেবল মিবার তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। মিবারের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের পুত্র অমরসিংহ কেবল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া পবিত্র বীরধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই। জাহাঁগীর প্রথমে এই রাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পিতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে যে বিশাল জনপদ বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, অসির পর অসির আঘাতে যে জনপদের বীরপুরুষদিগকে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন, মাসের পর মাসে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ও বহু সৈন্য পাঠাইয়া, যাহার অমূল্য স্বাধীনতা-রত্ন অপহরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, জাহাঁগীর এখন আবার সেই জনপদ আপনার বিজয়-পতাকায় পরিশোভিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার আদেশে সৈন্যগণ দিল্লীতে সমবেত হইল। তিনি ইহাদিগকে মিবারের অভিমুখে পরিচালিত করিলেন।

এইরূপে মোগল সৈন্য আবার মিবারের দ্বারদেশে উপনীত হইল। পবিত্রাত্মা প্রতাপসিংহ অমরলোকে গমন করিয়াছেন।

আজ তাঁহার আবাসভূমি অন্ধকার! কিন্তু এই অন্ধকার প্রদেশের দুই এক স্থানে দুই একটি উজ্জ্বল আলোক আপনার প্রভা বিকাশ করিতেছিল। প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পরে স্বাধীনতাভক্ত বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা আপনাদের বীরত্ব-মহিমার পরিচয় দিতেছিলেন। ইহাঁরা আত্মস্বাধীনতার অবমাননা করিলেন না, আত্মাদরের গৌরব খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন না। আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মাবমাননার পরিতর্পণে চেষ্টা পাইলেন না। ইঁহাদের সাহস ও পরাক্রম অটলভাবে রহিল, ইঁহারা প্রতাপসিংহের মহামন্ত্রে উদ্দীপ্ত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আক্রমণকারী মোগলের সমক্ষে অটল গিরিবরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন।

মিবারের ইতিহাসে ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দ একটি চিরস্মরণীয় পবিত্র বৎসর। এই বৎসরে মিবারের রাজপুতগণ আপনাদের পবিত্র স্বাধীনতার উদ্দেশে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করেন। অমরসিংহ মোগল সম্রাটের আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, মিবারের বীরপুরুষগণ এই পবিত্র দিনে তাঁহাকে সে বিষয়ে নিরস্ত করিয়া আপনাদের চিরন্তন মহাপ্রাণতার পরিচয় দেন। সাহসী চন্দাবত-কুলতিলক এই পবিত্র বৎসরে আসন্নমৃত্যু প্রতাপসিংহের মহৎ উপদেশের অনুসরণে সকলকে উত্তেজিত করেন, অমরসিংহ এই পবিত্র বৎসরে মিবারের তেজস্বী যুদ্ধবীরদিগের অপূর্ব্ব তেজস্বিতা দেখিয়া, আপনার পূর্ব্বতন সঙ্কল্পের জন্য বিরাগ ও অনুতাপের সহিত মহিমাময় বংশের গৌরব-রক্ষার্থ অগ্রসর হন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে প্রসিদ্ধ দেওয়ীরে মোগলের সহিত রাজপুতের যুদ্ধ হয়। মোগল সৈন্য এই গিরিসঙ্কটে

প্রবেশ করিলে, সাহসী রাজপুতেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। বহু ক্ষণ যুদ্ধ হয়, বহু ক্ষণ রাজপুতগণ এই গিরি-সঙ্কটে গিরিশ্রেষ্ঠের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া আপনাদের অলোক-সাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। পরিশেষে মোগলের পরাজয় হয়। দেওয়ারের যুদ্ধস্থলে রাজপুতের বিজয়-পতাকা অনন্ত গগনে উড্ডীন হইয়া রাজস্থানের অনন্ত মহিমা বিকাশ করে।

রাণা অমরসিংহের পিতৃব্য সাহসী কর্ণের পরাক্রমে এই যুদ্ধে রাজপুতদিগের জয়লাভ হয়। এই বীরপুরুষের সন্তান-গণ অতঃপর কর্ণাবত নামে প্রসিদ্ধ হন। সাহসী কর্ণের বীরত্বে বীরভূমি এক সময়ে এইরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহুবল-দৃপ্ত মোগলেরা এক সময়ে এই বীরপুরুষের বীরত্ব-গরিমায় পরাজিত হইয়া রাজপুতের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিল।

বীরবল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধি-রোহণ করেন, ভারতের জনপদের পর জনপদ যখন আকবরের অধীন হইতে থাকে, মোগলের বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া আইসে, তখন এক জন ভাট মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনার তীরবর্ত্তী কাল্পী নগর হইতে দিল্লীতে সম্রাট্‌সমীপে উপনীত হন। সুকণ্ঠ ভাটের মনোহর

সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর অভিনব সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে দিল্লীতে এই ভাটের কবিত্ব-শক্তি পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ভাট গীতি-কবিতা রচনা করিয়া ক্রমে দিল্লীর সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তাঁহার মোহিনী কবিত্ব-শক্তিতে, দিল্লীর সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সম্রাট্ এই প্রতিভাশালী সঙ্গীতনায়কের সঙ্গীত-মহিমার অসম্মান করিলেন না। তিনি আগন্তুক ভাটকে "কবিরায়" উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন।

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিলেন। এই অবধি ভাটের পূর্ব্বতন নাম পরিবর্ত্তিত হইল। অভিনব রাজা এই অবধি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন জনপদে বাস করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বতন নাম মহেশ দাস। কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ দাস নামেও উল্লেখ করিয়া থাকেন।

এই সময়ে কাঙ্গড়ার অধিপতি জয়চাঁদ কোন অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজ্য রাজা বীরবলকে দিতে অনুমতি করিলেন। জয়চাঁদের তেজস্বী পুত্র আকবরের নিকট অবনতি স্বীকার করিলেন না। তিনি পিতৃ-রাজ্য রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। আকবরের আদেশে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা

হুসেন কুলি খাঁ কাঙ্গড়া আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যাহা হউক, রাজা বীরবল এই রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কলিঞ্জ-রের নিকট আর এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ এই সময়ে তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করেন।

ভাট মহেশ দাস এখন "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ করিয়া, সহস্রপরিমিত সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। যিনি এক সময়ে চারণদলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাঁহার উপজীবি-কার বিষয় ছিল, তিনি এখন সহস্রপতি হইয়া দুরূহ রাজকীয় কার্য্যে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা বীর-বল প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গে থাকিতেন। যখন আকবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আপনাব সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোনখানে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইলে,সেই কার্য্য সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের উপ-রেই সমর্পিত হইত। বীরবল কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে অনলস ছিলেন। সাহস, ক্ষমতা ও তেজস্বিতা-বলে তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। কথিত আছে, তাঁহার কথায় আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয়। আকবর হিন্দুধর্ম্মের অনেক ব্যব-স্থায় শ্রদ্ধাবান্ হন।

১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্য কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল এই সাহায্যকারী সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে আকবরের সৈন্য-দলের পরাজয় হয়। আফগানেরা পার্ব্বত্য-প্রদেশের চারি দিক হইতে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল।

ইহাতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। বীরবল ও জৈন খাঁ অতি কষ্টে পশ্চাৎ হটিয়া আর এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আফগানেরা রাত্রিকালে আবার এই শিবির আক্রমণ করে। সম্রাটের অনেক সৈন্য এজন্য দুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হয়। আফগানেরা অনেককে হত্যা করে। এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত হন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর যার-পর-নাই শোকাতুর হইয়াছিলেন। বিশেষ তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়াতে আকবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে পাছে আকবর একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ আকবরের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল যে, বীরবল নিহত হন নাই। তিনি সন্ন্যাসীবেশে কাঙ্‌ড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। আকবর এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে এই কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে বীরবল কলিঞ্জরে বাস করিতেছেন বলিয়া আর একবার জনরব উঠে। এ জনরবেও আকবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বীরবল জীবিত আছেন। আকবর কলিঞ্জরেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন। রাজা বীরবল সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহাতে পরিস্ফুট হইতেছে।

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারের

বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বীরবল ফতেপুরসিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন। এই স্থলে তাঁহার আবাসগৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অসাধারণ সাহস।

উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে অনন্ত অসীম কালের পরিবর্ত্তন দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ব্রিটিশ শাসন বদ্ধমূল হইতেছে। ব্রিটিশ কোম্পানি ধীরে ধীরে বণিক-বৃত্তি ছাড়িয়া ভারত-সাম্রাজ্যের রাজনীতির পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনেরল্ মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ ভারতের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার শাসনে পিণ্ডারী দস্যুদিগের অধঃপতন হইয়াছে, নেপালের পার্ব্বত্য-প্রদেশে ব্রিটিশ সিংহের বিজয়িনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে, এবং মরহাট্টাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্র ইঙ্গ্‌রেজের প্রতাপ অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ মাস। মহারাও কিশোরী সিংহ কোটার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে আমোদের স্রোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। হস্তী ঘোটক প্রভৃতি নানাবেশে সজ্জিত হইয়া রাজ-সভার এক দেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যগণ যুদ্ধ-বেশ পরিগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব বীরত্ব-মহিমার পরিচয় দিতেছে। মহারাও কিশোরী সিংহ সুসজ্জিত সভাতলে রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে

বসিয়া গবর্ণর জেনেরলের প্রতিনিধির সমক্ষে রাজ-ধর্ম্ম প্রতি-পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। হরকুল-সম্ভূত বীর্য্যবন্ত রাজপুত-দিগের জয়-ধ্বনিতে পুণ্যভূমি হরবতী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই আমোদ দীর্ঘকাল থাকিল না। যে প্রীতির উচ্ছ্বাসে কোটার অধিবাসীগণ আপনাদের অভিনব রাজার প্রতি আদর দেখাইয়াছিল, সে প্রীতি দীর্ঘকাল কোটায় শান্তিসুখ অব্যাহত দেখিতে পারিল না। কিছুকাল পরে রাজ্যে নিদারুণ অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কোটার প্রধান সচিব রাজরাণা জলিম সিংহের সহিত কিশোরী সিংহের বিরোধ ঘটিল। জলিম সিংহ কিশোরী সিংহের পিতা উমেদ সিংহের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। রাজ্যশাসনের অনেক ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। এখন এই বর্ষীয়ান অমাত্য ও মহারাও কিশোরী সিংহের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। পূর্ব্বতন প্রীতি ও একতার স্থলে দুর্নিবার বিদ্বেষ ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করিল। এখন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ-স্থলে উপনীত হইলেন। গুরুতর আত্মবিগ্রহে হরবতী নর-শোণিতে রঞ্জিত হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা প্রভাত সময়ে জলিমসিংহের সৈন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর তটদেশ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী মহারাওর বিরুদ্ধে অগ্রসর হই-তেছে। তটভূমি অতি উচ্চ—সমুন্নত পর্ব্বতের ন্যায় লম্বভাবে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। এই উন্নত তটভূমি দিয়া প্রায় আট হাজার সৈন্য কুড়িটি কামান লইয়া ধীরে ধীরে যাই-তেছে। অকস্মাৎ ইহাদের গতিরোধ হইল। নদীর তটভূমির অদূরবর্ত্তী প্রান্তরের একটি উন্নত মৃত্তিকা-স্তূপ হইতে গুলির

পর গুলি আসিয়া এই সৈন্যদলে পতিত হইতে লাগিল। গুলি-বৃষ্টির বিরাম নাই। অবিরাম গুলি আসিয়া অগ্রবর্ত্তী সৈন্য-দলের অনেককে আহত করিল, অনেককে সেই ক্ষুদ্র স্রোত-স্বতীর উন্নত তটভূমিতে চিরনিদ্রিত করিয়া রাখিল। সৈন্যদল বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে মৃত্তিকা-স্তূপের দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটি বীরপুরুষের বিক্রমে তাহাদের গতিরোধ হইয়াছে। বীরদ্বয়ের একটি, মৃত্তিকা-স্তূপের পশ্চাতে থাকিয়া, বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিতেছে, অপরটি অব্যর্থ সন্ধানে গুলি বৃষ্টি করিয়া অরাতিপক্ষ নিপাত করিতেছে। এক দিকে আট হাজার সৈন্য ও কুড়িটি কামান, অপর দিকে কেবল দুইটি মাত্র বীরপুরুষ। বীর-যুগলের পরাক্রমে আজ এতগুলি সৈন্যের গতিরোধ হই-য়াছে, আজ এতগুলি সৈন্য ইহাদের গুলির, আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া নদী-তটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বীর-যুগল মহারাও কিশোরী সিংহের প্রভুভক্ত সৈন্য—পুণ্যভূমি হরবতীর হরকুল-সম্ভূত বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়। আজ এই প্রভুভক্ত ক্ষত্রিয় বীরদ্বয় আপনাদের অপার প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইতে বহুসংখ্য সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

বীর-যুগলের তেজস্বিতার গতিরোধে অসমর্থ হইয়া বিপক্ষ-গণ তাহাদের সম্মুখে দুইটি কামান স্থাপিত করিল। কামানের ধ্বনি শুনিবামাত্র বীরদ্বয় সেই উন্নত মৃত্তিকা-স্তূপের শিখর-দেশে দাঁড়াইল—অসম সাহসে, গম্ভীর ভাবে আপনাদের তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান জন্য বিপক্ষদিগকে অভিবাদন করিল। বিপক্ষ সৈন্যদল হইতে, গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। গুলির আঘাতে বীর-যুগলের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল। সাহসী ক্ষত্রিয়-

দ্বয় এইরূপ আহত হইয়াও শত্রু-সংহারে নিরস্ত থাকিল না। যদিও ইহাদের আক্রমণে বিপক্ষদল বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তথাপি সেই সৈন্যদলের অধিনায়কগণ অলোক-সাধারণ বীরত্ব ও সাহসের জন্য ইহাদিগকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। অবিলম্বে গুলিবৃষ্টি বন্ধ করিতে আদেশ প্রচারিত হইল। সৈন্যদল আদেশ পালন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সৈন্যদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, দুই জন মাত্র সৈন্য আক্রমণকারী বীরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। এই আদেশ শুনিবামাত্র দুই জন তরুণবয়স্ক রোহিলা অগ্রসর হইল। বীর-যুগল গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। অবিরত শোণিতস্রাবে তাহাদের শক্তি ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এ আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারিল না। অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া সেই উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপের উপর উভয়ে পড়িয়া গেল। আর তাহাদের চেতনার সঞ্চার হইল না। তেজস্বী বীরদ্বয় ধীরভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া অসাধারণ তেজস্বিতার পরিচয় দিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও হরবতীর হরগণ এইরূপ সাহস-সম্পন্ন ছিল, এইরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া আপনাদের জন্মভূমি উজ্জ্বল বীরত্ব-কীর্ত্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি।

মোগল-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়, আওরঙ্গজেবের কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্রই ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত

হইয়া উঠে, স্বাধীনতার প্রধান উপাসক, তেজস্বিতার অদ্বিতীয় অবলম্ব, সাহসের একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অনুগত হন, তখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম-শৈলমালা-পরিবৃত পবিত্র ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি ধীরে ধীরে আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, সকলের হৃদয়ের গভীর বিস্ময়ের রেখাপাত করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ইহার বিক্রমে কম্পিত হন, ক্রমে ইহা একই উৎসাহ ও তেজস্বিতার স্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দু-রাজ-চক্রবর্ত্তী ভবানী-ভক্ত শিবজী।

শিবজী বীরত্বের জলন্ত মূর্ত্তি—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়-ক্ষেত্র। যখন শিবজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্ব্বতন বীরত্ব-বৈভব ধীরে ধীরে সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া অনন্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সন্তানগণ পরাধীনতার নিগড়ে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের আনুগত্য স্বীকারই যেন আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন; যে তেজস্বিতার বলে পৃথ্বীরাজ পবিত্র তিরৌরী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমর সিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভৈরব রবে বিধর্ম্মী শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং শেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ দীর্ঘ কাল, প্রবলপরাক্রম, সহায়সম্পন্ন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল, অনৈক্য প্রযুক্ত বীর্য্যবন্ত

আর্য্যপুরুষেরা ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং মুসলমানের পদানত হইয়া আপনাদের শোচনীয় অধঃপতনের চরম ফল, ভোগ করিতেছিলেন। মহাপরাক্রম শিবজী এই অনৈক্য দূর করেন, এবং জাতি-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া দক্ষিণাপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। ইঁহার মহামন্ত্রে অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, এবং বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুর পদানত হইয়া পড়ে।

ভারত-মানচিত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শৈলমালা-পরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই প্রদেশের উত্তরে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছে, পশ্চিমে অপার অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গ-লীলা বিস্তার করিয়া, জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্ব্বে বরদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল পার্ব্বত্য ভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। এই প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। ইহার পরিমাণ-ফল ১০২,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত। ইহার অভ্যন্তরে দুরারোহ সহ্যাদ্রি উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ-শ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ সুশোভিত। যেন পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখিয়াছেন। চক্ষে না দেখিলে এই অনন্ত ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতির এই প্রিয়তম আবাস-ক্ষেত্রে, অনন্ত জগতের এই সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ভূখণ্ডে শিবজীর জন্ম হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথের অনেক স্থলে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল। বিজয়পুরের মুসলমান রাজারা

বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামে এক'জন মহারাষ্ট্র-বাসী ব্রাহ্মণ যুবক এই বিজয়পুরের রাজ-সরকারে চাকরী করিতেন। ক্রমে বিষয়-কর্ম্মে শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে শাহজী বিজয়পুরের অধিপতির গণনীয় কর্ম্মচারীর শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া উঠেন। শাহজী জিজি বাই নামে একটি মহারাষ্ট্র-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজি বাইয়ের গর্ভে শাহজীর দুইটি পুত্র সন্তান জন্মে; প্রথমের নাম শম্ভুজী, দ্বিতীয়ের নাম শিবজী।

শিবজী ১৬২৭ অব্দে মে মাসে পূনার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনেরী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার বড় একটা স্নেহের পাত্র ছিলেন না। শাহজী, শিবজী অপেক্ষা শম্ভুজী-কেই অধিক ভাল বাসিতেন। এজন্য তিনি শম্ভুজীকে আপনার নিকট রাখেন। শিবজী মাতার সহিত থাকেন। শিবজীর জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে শাহজী টুকা বাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্র-রমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করাতে জিজি বাইয়ের সহিত শাহজীর বিরোধ উপস্থিত হয়, এজন্য শিবজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতার দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী দাদাজী কর্ণদেব নামে এক ব্যক্তিকে শিবজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূনার জাইগীরের তত্ত্বাবধান জন্য নিযুক্ত করেন। দাদাজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজি বাইয়ের জন্য পূনাতে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পূনার এই নূতন বাড়ীতে দাদাজী কর্ণদেবের তত্ত্বাবধানে শিবজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা কদাচিৎ লেখা পড়া শিখিত। লেখা পড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুষোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শিবজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তীরনিক্ষেপে, তরবারি-প্রয়োগে, বড়শা-সঞ্চালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী এ বিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বচালনা-কৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাঁহার গুণ গান করিত। দাদাজী শিবজীকে আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আস্থাযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। শিবজী পবিত্র হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায় তাঁহার বিশেষ সুখানুভব হইত। বাল্যকাল হইতে কথকতার উপর তাঁহার এমন শ্রদ্ধা ছিল যে, যেখানে ঐ কথকতা হইত, তিনি নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইতেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে এইরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবজী হিন্দু নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিবজী আপনার জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ভীক-হৃদয়ে অবিচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবজীর তেজস্বিতা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। শিবজী মোগল-শাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ও চেষ্টা বিফল হয় নাই। যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল,তখন দক্ষিণাপথে শিবজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা-ভক্ত মহাবীরের অপূর্ব্ব বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। হিন্দুকীর্ত্তির গৌরবে বহুদিনের পর আবার হিন্দুর পবিত্র ভূমি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিবজী মাওয়াল নামক পার্ব্বত্য স্থানের অধিবাসী মাওয়ালীদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ইহারা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন ছিল। শিবজী এই মাওয়ালী সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থানে আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি বাল্যকালেই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার এই মুসলমান-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি প্রায়ই কহিতেন "আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। শিবজী মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া স্বাধীন হিন্দু-ভূপতির সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে শিবজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, দাদাজীর শাসন অতিক্রম করিয়াও অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি গিরি-দুর্গ ছিল। শিবজী কৌশলক্রমে এই গিরিদুর্গের অনেকগুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দুর্গগুলি বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল। শিবজী উহা অধিকার করাতে বিজয়পুরের রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। আফজল্ খাঁ বিজয়পুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শিবজী এই সময়ে প্রতাপগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই স্থানে থাকিয়া আফজল্ খাঁকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না। সুসময় সম্মুখবর্ত্তী হইল, সুসময়ে শিবজী বিজয়-পুরের সৈন্যের সম্মুখে প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তিনি আফজল্ খাঁকে জানাইলেন যে, বিজয়পুরের অধিপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। তিনি আপনার ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। যদি আফজল্ খাঁ দয়া করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে তিনি নিজের অধি-কৃত প্রদেশ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

শিবজীর এইরূপ অবনতিস্বীকারের কথায়, আফজল্ খাঁ সন্তুষ্ট হইলেন। জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়া যে, কত দূর কষ্টকর, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। এখন

শিবজী আপনা হইতেই তাঁহার অনুগত হইবেন, ইহা ভাবিয়া আফজল খাঁ অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া, পন্তজী গোপীনাথ নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে শিবজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূত দুর্গের নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবজী দুর্গ হইতে নামিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পন্তজী ধীরতার সহিত শিবজীকে কহিলেন, "শাহজীর সহিত আফজল খাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। আফজল বন্ধুর পুত্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি আপনার সহিত শত্রুতা না করিয়া আপনাকে একটি জায়গীরের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন।" শিবজী বিশেষ সৌজন্য ও বিনয়-নম্রতার সহিত আফজল খাঁর প্রেরিত দূতকে বলিলেন, "একটি জায়গীর পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব; আমি বিজয়পুর ভূপতির এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র।" দূত শিবজীর এইরূপ শীলতা ও নম্রতা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিবজী দূতের আবাস জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে দূতের সহচরগণ কিছু দূরে অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা গভীর নিশাথে শিবজী পন্তজী গোপীনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি হিন্দুজাতির পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান রক্ষার জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে, পবিত্র দেব-মন্দিরের অবমাননাকারীদিগকে শাস্তি দিতে, এবং স্বধর্ম্ম-বিরোধী শত্রুগণের ক্ষমতার গতিরোধ করিতে আমার বিশেষ

আগ্রহ আছে। আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র কার্য্য সাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার আশা আছে যে, স্বজাতি ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।" শিবজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া পন্তজীকে একখানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পন্তজী এই তরুণ-বয়স্ক হিন্দুবীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেব-ভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন। আর তাঁহার মুখ হইতে শিবজীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বাহির হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবজীর কার্য্য সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন শিবজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবজীর আশা ফলবতী হইল। পন্তজী গোপীনাথ শিবজীর সাহস, স্বদেশ-ভক্তি ও বাক্‌চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চিরসহচরের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে আফজল খাঁ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। শিবজী প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটি স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি এই স্থানের জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলেন, এবং আফজল খাঁর আসিবার পথ পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় রহিল। শিবজী এই জঙ্গলে আপনার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। বিজয়পুরের সৈন্যগণ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফজল খাঁ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি যুদ্ধবেশে সজ্জিত ছিলেন না; তাঁহার পরিচ্ছদ

মোটা মস্‌লিনের ছিল। পার্শ্বদেশে কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। পনর শত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে এই সকল সৈন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আফজল খাঁ কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র সৈন্য লইয়া পাল্কীতে শিবজীর নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে শিবজী আপনার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ লৌহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল। এই বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্র-নখ * সন্নিবেশিত রহিল। অপরে না জানিতে পারে, এজন্য তিনি বর্ম্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া শিবজী ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়া যথোচিত শীলতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফজল খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আফজল খাঁর ন্যায় তাঁহার সঙ্গেও এক জন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অকস্মাৎ আফজল খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ আফজল খাঁ "ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গন-সময়ে শিবজী আফজল খাঁর উদরে বাঘনখ প্রবেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যাতনায় অধীর হইয়া আফজল খাঁ শিবজীকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবজীর কার্পাস-বস্ত্রের নিম্নে লৌহ-বর্ম্ম থাকাতে এই আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য নিমেষ মধ্যে ঘটিল। নিমেষ মধ্যে শিবজী অস্ত্রচালনা করিয়া

* বৃশ্চিক, বৃশ্চিকসদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রনখের আকার অস্ত্র।

আফজল খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল খাঁর অনুচর ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। সে অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহস সহকারে প্রভুহন্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসরে পাল্কী-বাহকেরা আফজল খাঁকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের এই উদ্যম সফল হইল না। শিবজীর কয়েক জন সৈন্য হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আফজল খাঁর শিরশ্ছেদপূর্ব্বক ছিন্নমস্তক প্রতাপগড়ে লইয়া গেল। এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মাও-য়ালীগণ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একেবারে চারি দিক হইতে বিজয়পুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষগণ ইহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিল। শিবজী বিজয়ী হইলেন। মহারাষ্ট্র-চক্রে তাঁহার অপরিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল। তিনি অবিলম্বে বহু সৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

যাঁহারা সরল হৃদয়, জীবনের প্রতিকার্য্যে যাঁহারা আপনাদের সরলতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কার্য্যে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া শিবজীকে ধিক্কার দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্দ্দান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত হইয়া থাকেন, স্বদেশদ্রোহীর মধ্যে স্বতন্ত্র রাজত্ব স্থাপনে যাঁহাদের প্রয়াস হয়, তাঁহারা অন্যভাবে এ বিষয়ের বিচার করিবেন। মুসলমানের চাতুরীবলে ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। যখন মহাবীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া দৃশদ্বতীর তীরে সমাগত হন,

তখন দুরন্ত সাহাবদ্দীন গোরী তাঁহার অলোক সাধারণ তেজস্বিতা ও প্রভূত সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই সাহাবদ্দীন চাতুরী অবলম্বন করিয়া ঘোর রাত্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর অজ্ঞাতসারে হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে, সহসা পৃথ্বীরাজের পতন হইত না, এবং সহসা অনন্ত অতল জলে ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন ডুবিত না। যাহারা এইরূপ চাতুরী—এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, ইহা শিবজী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, চতুরের সহিত চাতুরী ও শঠের সহিত শঠতা না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমান-সাম্রাজ্য অধঃকৃত করিয়া হিন্দুরাজ্যের গৌরব স্থাপন করিতে পারিবেন না। যে দস্যু অগোচরে অজ্ঞাতসারে আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহার নিকট সরল ভাবের পরিচয় দিলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শিবজী বাল্যকাল হইতেই এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নীতি-শিক্ষা-বলেই তিনি অভীষ্ট মন্ত্রসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষিতায় উদ্দীপ্ত হইয়া দুরন্ত চতুর শত্রুর ঘোরতর অত্যাচারের গতিরোধে উদ্যত হন, তাঁহাদের নিকট শিবজীর এই শিক্ষার ফল কখনও অনাদৃত হইবে না।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড কঙ্কণ নামে পরিচিত বিজয়পুরের সৈন্যের পরাজয়ের পর কঙ্কণপ্রদেশের অধিকাংশ শিবজীর হস্তগত হয়। ইহার পর শিবজী কঙ্কণের পানেলা দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হন। এই দুর্গ বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী পানেলা দুর্গ

অধিকারেও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি আপনার কতিপয় প্রধান সেনা-নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ করেন। ইহাতে সেনা-নায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন আট শত সৈন্যের সহিত শিবজীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পানেলা দুর্গাধ্যক্ষের নিকট উপনীত হন। দুর্গাধ্যক্ষ ইঁহাদের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না, শিবজীর সহিত ইঁহাদের অসদ্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, হৃষ্টচিত্তে ইঁহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এ দিকে শিবজী অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীরের সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীরের সম্মুখে ছিল। শিবজীর যে সকল সর্দ্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে তাঁহারা এই সকল বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহির হইতে শিবজী ও তাঁহার অনুচরদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া, দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবজীর এত দূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষেরা আসিয়া তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। বলবৃদ্ধির সহিত শিবজী অধিকতর সাহসিক কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ মুসলমান ভূপতির অধিকৃত নানা-জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহাদের উদ্যম, সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজয়পুরের নগরপ্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিজয়পুর ভূপতি ক্রুদ্ধ হইল, বশ্যতাস্বীকারের জন্য শিবজীর নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত শিবজীর নিকট উপস্থিত হইল।

শিবজী ধীরগম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন, "দূত ! আমার উপর তোমার প্রভুর এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইব। শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।" দূত চলিয়া গেল। বিজয়পুরের অধিপতি শিবজীর এই উদ্ধতভাবের জন্য অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন; কহিলেন, "তোমার পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া, তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।" পিতার কারারোধের সংবাদে শিবজী কিছু শঙ্কিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলেন না। কয়েক বৎসর পরে বিজয়পুর-রাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিলেন। বিমুক্ত হইয়া শাহজী, রায়গড়ে আপনার এই দুর-দৃষ্টের মূল—তনয়ের কাছে গেলেন। শিবজী, পিতার সমুচিত সম্মান করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি পিতাকে গদিতে বসাইয়া, তাঁহার পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য ভৃত্যের ন্যায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর শিবজী কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবজী পুনর্ব্বার আপনার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এ বার বিজয়পুর-রাজ শিবজীকে পরাজিত করিবার জন্য বহুসংখ্য সৈন্য পাঠাইলেন। এক জন রণদক্ষ আবিসিনীয় সর্দ্দার এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন। বিজয়পুরের সৈন্য শিবজীকে পানেলা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এ বারেও শিবজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে আবিসিনীয় সর্দ্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিজয়পুর-ভূপতি অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, এই সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড করিলেন।

যখন আওরঙ্গজেব তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবজীর নিকট কয়েক-জন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার পাঠাইয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবজী আওরঙ্গজেবের এই ন্যায়-বহির্ভূত কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহার প্রার্থনাও গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক হন নাই। তিনি আওরঙ্গজেবের গর্হিত কার্য্যের কথা শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত দূতকে বিদায় দেন এবং দূত আওরঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা ও বিরাগের সহিত, কুকুরের লাঙ্গূলে বান্ধিয়া দিতে অনুমতি করেন। এই অবধি শিবজীর উপর আওরঙ্গজেবের প্রগাঢ় বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই অবধি আওরঙ্গজেব শিবজীকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া অভিহিত করিয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এ দিকে শিবজীর সহিত বিজয়পুর-রাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবজী সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য হইয়াছিল।

বিজয়পুর-রাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবজী মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীশ্বরের অধিকার বিলুণ্ঠন করিয়া, পুনায় ফিরিয়া আসিলেন। শায়েস্তা খাঁ এই সময়ে দক্ষিণাপথের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশ

অনুসারে শায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য লইয়া আওরঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। শিবজী মোগল সৈন্যের আগমন-সংবাদ শুনিয়া, রায়গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ পুনা অধিকার করিয়া, দাদাজী কর্ণ-দেবে যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ শিবজীর কৌশলের কথা জানিতেন। এজন্য সাবধানে আপনার আবাস গৃহ সুরক্ষিত রাখিলেন। তাঁহার অনুমতি-পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় পূনায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু মোগল শাসন-কর্ত্তার এ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর শিবজীর সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পূনার পথ ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহ-যাত্রী রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে পূনার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী শিবজী এই সুযোগে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেনানিবেশ করিয়া, স্বয়ং কেবল পঁচিশ জন অনুচরের সহিত সেই বিবাহযাত্রীর দলে মিশিলেন। বরযাত্রীর দল আমোদ করিতে করিতে পূনায় প্রবেশ করিল, শিবজীও তাহা-দের সঙ্গে মিলিয়া, পূনায় উপনীত হইয়া একবারে আপনার বাস-ভবনে পঁহুছিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। শায়েস্তা খাঁ শয়ন-গৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। এই সময় আক্রমণ-

কারীগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি কোন প্রকারে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ, সকলে নিহত হইল। শিবজী জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, বহুল মশালের আলোকে যাইবার পথ উদ্দীপ্ত করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত মহারাষ্ট্রে মহাবীর শিবজীর এই বীরত্ব-কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত হইল। সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশীয় মহাবীরের এই অপূর্ব্ব বীরত্বে বিভোর হইয়া, তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, বহু বৎসর অতীত কালের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবজীর এই সাহস ও বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা আজ পর্য্যন্ত আহ্লাদের সহিত শিবজীর এই সাহস ও বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সিংহগড়ের অভিমুখে আসিল। শিবজী ইহাদিগকে দুর্গের নিকট আসিতে অনুমতি দিলেন। ইহারা মহাবিক্রমে রণডঙ্কাধ্বনির সহিত নিষ্কোশিত তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন শিবজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত করিলেন। ইহারা তোপের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না, সন্ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। শিবজীর এক জন সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রথম বার মোগল সৈন্য শিবজীর সৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত ও তাড়িত হইল। শিবজী আপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব-বলে বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন।

ইহার পর শিবজী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরাট নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জলপথেও আধিপত্য স্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরি ছিল। এই সকল রণতরি দ্বারা মোগল সম্রাটের রণতরি অধিকৃত হইল।

শিবজী সুরাট লুণ্ঠন করিয়া আসিয়া, শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে শিবজী সিংহগড়ে আসিয়া, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, আপনার প্রধান অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত জনপদের শাসন-প্রণালীর সুন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ে শিবজী "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগল সাম্রাজ্যের মহাপ্রতাপের মধ্যে ভারতের মহাবীর স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বাধীনভাবে শাসন-দণ্ড-পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কা-যাত্রীগণ সুরাট বন্দরে আসিয়া জাহাজে উঠিত। এজন্য মুসলমানগণের মধ্যে সুরাট একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পবিত্র স্থান বিলুণ্ঠন ও শিবজীর "রাজা" উপাধি-গ্রহণ-সংবাদে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবজী ইঁহাদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রীকে জয়সিংহের নিকট পাঠাইলেন। জয়সিংহের সহিত দূতের অনেক

কথা হইল। দূত বিদায় লইয়া শিবজীর নিকট আসিলেন। শিবজী বীর-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যল্প অনুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া; আপনার পরিচয় দিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য এক জন সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাইলেন। শিবজী শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইলে জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট সমস্তই অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবজী মোগলের পক্ষ হইয়া, বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ; পরবর্ত্তী বৎসর সম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার পুত্র, পাঁচশত অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন।

শিবজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত এই পরাক্রান্ত হিন্দুভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না। তিনি শিবজীকে আপনাদের প্রজাগণের সমক্ষে অপদস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিবজী সম্রাটের সভাগৃহে সমাগত হইলে আওরঙ্গজেব আদর না করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণের আসনে বসাইয়া দিলেন। শিবজী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সভা-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট তাঁহার বাসগৃহে প্রহরী রাখিতে নগরের কোতোয়ালকে বলিয়া দিলেন। এ দিকে চতুর মহা-

রাষ্ট্রপতি, দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না বলিয়া, তাহাদিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট অনুমতি চাহিলেন। সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে শিবজী সহায়-বিহীন, সুতরাং তাঁহার আয়ত্ত হইবেন ভাবিয়া, সম্রাট তৎ-ক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর শিবজী পীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, এই কথা ঘোষণা করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়ি পূর্ণ করিয়া ফকীর সন্ন্যাসীদিগকে মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এই-রূপে তাঁহার আবাস-গৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রহরীদিগের সংস্কার জন্মিল যে, ঝুড়িতে কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন সন্ধ্যার সময় শিবজী এক ঝুড়িতে নিজে চড়িয়া এবং আর একটিতে তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে চড়াইয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবজী সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগে শম্ভুজীকে রাখিয়া তৎপরদিন মথুরায় উপনীত হইলেন। এইখানে কতিপয় বন্ধুর নিকট শম্ভুজীকে রাখিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে আসিলেন। ইহার পর তাঁহার বন্ধুগণও শম্ভুজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন।

এই সময়ে বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পাছে শিবজী বিজয়পুর-রাজের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গ-জেব তাঁহাকে এক জাইগীর দিয়া "রাজা" উপাধি দৃঢ়তর করি-লেন। ইহার পর শিবজী বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন।

কিছু দিনের জন্য যুদ্ধের বিরাম হইলে শিবজী নিজ রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। তিনি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; কৃষকদিগের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে যাইত। শিবজী আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা এই রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সৈন্যদিগকে রাজ-কোষ হইতে বেতন দিবার নিয়ম করেন। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশই মাওয়ালীজাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা মাসে ৩।৪ টাকা হইতে ১০।১২ টাকা বেতন পাইত, অশ্বারোহী সৈন্য "বর্গী" ও "শিল্লীদার," এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বর্গীরা অশ্ব ও মাসে ৬।৭ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। শিল্লীদারেরা আপনাদের অশ্বে কাজ করিত। ইহাদের বেতন ১৮।২০ টাকা হইতে ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। লুণ্ঠনে যাহা পাওয়া যাইত, তৎসমুদয় রাজ-কোষে জমা হইত। লুণ্ঠনকারীরা কেবল উপযুক্ত পারিতোষিক পাইত। ১০ জন সৈন্যের উপর এক জন নায়ক, ৫০ জনের উপর এক জন হাবিলদার ও ১০০ জনের উপর এক জন জুমলাদার থাকিত। হাজার পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষকে এক হাজারী বলা যাইত। পাঁচ হাজারীর উপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন।

পদাতিকদিগের ন্যায় অশ্বারোহী সৈন্যেরও শ্রেণী ছিল। ২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর হাবিলদার, ১২৫ জনের উপর জুমলাদার ও ৬২৫ জনের উপর সুবাদার ছিল। ৬,২৫০ জন

অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে পাঁচ হাজারী কহা যাইত। তরবারি, ঢাল ও বড়শা অশ্বারোহীদিগের প্রধান অস্ত্র ছিল। ইহাদের অশ্বগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব ও দ্রুতগামী হওয়াতে ইহারা অনায়াসে ত্বরিত গতিতে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমন করিতে পারিত।

হিন্দুদিগের মতে শরৎকালই দিগ্বিজয়-যাত্রার সময়। প্রতাপশালী শিবজী এই সময়ে আড়ম্বরসহকারে দশভুজা দুর্গার পূজা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। শিবজী শত্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এইরূপ পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের উপর মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপিত হয়, এবং এইরূপে মরহাট্টাগণ, সাধারণের নিকট একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে।

আওরঙ্গজেব বাহিরে সৌজন্য দেখাইয়া, শিবজীকে আর একবার হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবজী আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে জড়িত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাপথের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং মোগল সম্রাট্‌কে এখন বাধ্য হইয়া শিবজীর সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় আপনার বীরধর্ম্ম রক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয়-পতাকা স্থাপিত হইল। শিবজী ইহার পর পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আর এক

বার সুরাট নগরে উপনীত হইলেন। তিন দিন ধরিয়া নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই তেজস্বী মহারাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবজী অবাধে সুরাটের ধনসম্পত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবজী যখন সুরাট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক এক জন মোগল সেনাপতি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। শিবজী দায়ুদ খাঁকে আক্রমণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এ দিকে তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও খান্দেশ প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে কর সংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবজীর এইরূপ প্রভাব ও আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে মহব্বৎ খাঁর অধীনে চল্লিশ হাজার সৈন্য দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে বিমুখ হন নাই। তিনি মরোপন্থ ও প্রতাপ রাও নামক আপনার দুই জন প্রধান সেনাপতিকে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতি-দ্বয়ের আগমন সংবাদ শুনিয়া মহব্বৎ খাঁ ইখলাস খাঁর অধীনে বহুসংখ্য সৈন্য ইহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহাদের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২২ জন সেনানায়ক নিহত হন। কয়েক জন প্রধান সেনাপতি আহত হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে, শিবজীর সৈন্যগণ বিজয়-লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত হয়। তাহাদের বিজয়িনী শক্তির মহিমা চারি দিকে পরিকীর্ত্তিত

হইতে থাকে। শিবজী মহাপরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত হন; তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সমর-চাতুরীতে সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অলোক-সাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া মনে করিতে থাকে। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই পরাক্রান্ত শত্রুর অপূর্ব্ব প্রভাবে স্তম্ভিত হন। এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন, শিবজী তাঁহাদের সহিত কোনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি বন্দীদিগকে প্রভূত সম্মানের সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষত স্থান ভাল হইলে প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। ভারতের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ পবিত্র বীর-ধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। আহত বন্দীগণকে রায়গড়ে কখন কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিবজীর আদেশে ইঁহাদের যথোচিত শুশ্রূষা হইয়াছিল। পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবজী প্রকৃত বীরোচিত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহত্ত্ব ও এই উদারতা অনন্তকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে।

শিবজী পূর্ব্বেই রাজা উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। অভিষেক-কার্য্য সম্পাদনের জন্য গঙ্গাভট্ট নামক এক জন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জুন প্রাতঃ-স্মরণীয় পবিত্র দিনের মধ্যে পরিগণিত। এই পবিত্র দিনে দুরা-

রোহ শৈল-শিখরবর্ত্তী রায়গড়ে মহারাজ শিবজী স্বাধীন হিন্দু-রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। শাস্ত্র-পারদর্শী গঙ্গাভট্ট এই পবিত্র দিনে শিবজীকে যথাশাস্ত্র রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে অনেক ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে রায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ হয়। বহু দিনের পর স্বাধীনতাভক্ত হিন্দু বীরগণের পবিত্র জয়-ধ্বনিতে রায়গড় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মহাবীর শিবজী রাজ-বেশে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই পবিত্র দিনের স্মরণার্থ একটি অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রাজ্যসম্পর্কীয় উপাধি সকল পারস্য নামের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত নামে অভিহিত করিতে আদেশ দেন। এইরূপে শিবজীর অভিষেক-কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে এই শেষ বার পরাধীন পর-পীড়িত ভারতের হিন্দু বীর আপনার অসাধারণ বীরত্ব-বলে দুরন্ত শত্রুর মধ্যে রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার মহিমায় গৌরবান্বিত হন।

শিবজী রাজপদবী গ্রহণ করিয়া, যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। তিনি এই বিস্তৃত রাজ্য-শাসনে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধি-কারে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল প্রকাশিত হয়, তিনি অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দেন। শিবজী ইহার পরেও, নানাস্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যগণ এক সময়ে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনানী দিলির খাঁ বিজয়পুরের অধি-পতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজয়পুর-রাজ শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবজী এই সাহায্যদানে অসম্মত হন নাই। তাঁহার সমর-চাতুরীতে দিলির খাঁ এমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া

উঠেন যে, তাঁহাকে অগত্যা বিজয়পুর পরিত্যাগ করিতে হয়। বিজয়পুররাজ এজন্য ভূসম্পত্তি দিয়া শিবজীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে নানাস্থানে নানাবিষয়ে আপনার অসামান্য সাহস, অপরিমেয় ক্ষমতা ও অবিচলিত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, মহাবীর শিবজী ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হন। তাঁহার হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি রায়গড়ে গমন করেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরের আর বিরাম হইল না। শিবজী জ্বরারম্ভের সপ্তম দিবসে ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল ৫৩ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অসাধারণ বীরপুরুষের অসাধারণ ঘটনাপূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষের সমস্ত কার্য্যই লোকাতীতভাবে পরিপূর্ণ। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটও তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্য রোধে সমর্থ হন নাই। যখন তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমরপটুতা, তাঁহার সাহস ও তাঁহার রাজ্য-শাসনের কথা মনে হয়, তখন তাঁহার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে, বন্ধুজনের অনভিমতে নিঃসহায় নিরবলম্ব হইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও অধ্যবসায়-বলে আপনার গুরুতর সাধনায় সুসিদ্ধ হন, এবং কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করেন।

শিবজী স্বজাতির পূর্ব্বতন গৌরবের উদ্ধারকর্ত্তা। বহুশতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত, নিষ্পেষিত হইতেছিল, যে জাতি স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পরাধীনতা স্বীকারই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছিল, শিবজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে আনয়ন করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ প্রসারিত। করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা-ভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে

স্থাপিত করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে, তাঁহার ক্ষমতাপ্রভাবে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে—নিপীড়নের ভয়াবহ কালে, হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে, আর কোন হিন্দুবীরকর্তৃক এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবজী সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বস্তুতঃ সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায় তৎকালে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য মূষিকের ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট এত দূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা তিনি উঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আওরঙ্গজেব শিবজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া কহিয়াছিলেন, "শিবজী এক জন প্রধান সেনাপতি ছিল; যখন আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নতন রাজ্য স্থাপন করে। আমার সৈন্য উনিশ বৎসর কাল তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি তাহার রাজ্যের কোন অবনতি হয় নাই।" আওরঙ্গজেবের কথাতেই শিবজীর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিবজী শত্রুর অপকারী ছিলেন। কিন্তু যাহারা পরাজিত ও বন্দীভূত হইত, তাহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্মীয় জন ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেন না। এইরূপ সদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহার অনুরক্ত ছিল। মিতাচার তাঁহার একটি গুণ ছিল। অসাধারণ ক্ষমতার ও অপরিমিত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও তিনি কখন সৌখীনতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার নিকট ভোগ-বিলাসের আদর ছিল না। তিনি সামান্য বেশে ও সামান্য আহারপানে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

শিবজী দক্ষিণাপথে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার দৈর্ঘ্য চারি শত মাইল, বিস্তার এক শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোরেও তিনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন নর্ম্মদা হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত, কঙ্কণ হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সকলেই শিবজীকে কর দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। সমগ্র দক্ষিণাপথে তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। দক্ষতায়,একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, এবং কেহই তাঁহার ক্ষমতা রোধে সাহস পাইত না। তিনি মুসলমানদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জানিতেন। মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে, স্বদেশের অধঃপতন হইয়াছে, ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসের বহির্ভূত কার্য্য করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবজী খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বাহুযুগলের দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত। তাঁহার অনুরক্ত স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তিনি আপনার তরবারির নাম "ভবানী" রাখিয়াছিলেন। এই তরবারি সেতারার রাজার অধিকারে রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সেতারার রাজসংসারে শিবজীর ভবানীর পূজা হইয়া থাকে।